Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পারুল আক্তার

রোলঃ 227021445

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পারুল আক্তার

রোলঃ 227021445

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে পারুল আক্তার, আইডিঃ 227021445 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Parul

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

পারুল আক্তার

আইডিঃ 227021445

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

বিষয়ঃ ইসলামে নারীর ভূমিকা

নামঃ পারুল আক্তার
রোলঃ ২২৭০২১৪৪৫

শুরুর কথা

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালা অশেষ দয়া ও মেহেরবানী এই যে তিনি আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জানার তৌফিক দান করেছেন যে বিষয় সম্পর্কে জানা ও এর ইতিহাসের উপর আমল করা প্রত্যেক মুমিনা নারীদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টি হচ্ছে ইসলামে নারীর ভূমিকা।

ইসলামিক সভ্যতা একাধিক দিক থেকে সম্মৃদ্ধ ও উন্নত।এ সভ্যতার গঠন ও বিকাশে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীর সাহিত্য ভান্ডার এর একটি বড় অংশ গড়ে উঠেছে নারী জাতিকে নিয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নারী পুরুষের কিছু জিম্মাদারি রেখেছেন যৌথ যাতে নারী পুরুষ সমানভাবে অংশীদার। আবার কিছু জিম্মাদারি রেখেছেন আলাদা আলাদা। এজন্য আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ষেত্রেই কোরআন কারীমে একজনকে সম্বোধন করা হলেও তার লক্ষ্যে থাকে নারী-পুরুষ দুইজনই আবার কখনো দুইজনকেই আলাদা আলাদা সম্বোধন করা হয়।
অবশ্য নারীদের যে বিশেষ যে জিম্মাদারি রয়েছে যাতে পুরুষের কোন অংশীদারি নেইতার গুরত্ব ও কোন অংশেই কম নয়। বরং তা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এগিয়ে যাওয়া কেবল মাতৃজাতির প্রতি অবিচারই নয় বরং মানব সভ্যতার জন্যই বিরাট হুমকি। কেননা মানবসভ্যতা নারী পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক খেদমত ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই টিকে থাকে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই নারীসমাজকে সঠিক দিশা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নয়নের প্রধান কারিগর হিসেবে দেখা হয়েছে। নারীরা ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা, অর্থনীতি,সংস্কৃতি এবং সামাজিক খাতে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

নারীকে ইসলাম পরিবার ও সমাজের স্তম্ভ হিসেবে দেখেছে। পরিবারের মধ্যে একজন মা, স্ত্রী, মেয়ে বা বোন হিসেবে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। একজন মা হিসেবে নারীকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট

সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে..." (সুরা লুকমান: ১৪)। হাদিসে আরও বলা হয়েছে, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত" (তিরমিজি)।

নারী একজন স্ত্রী হিসেবে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা, ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলে। ইসলামে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার যেমন রয়েছে, তেমনি স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলাম স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে" (তিরমিজি)।

নারীকে জ্ঞানার্জনেও উৎসাহিত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাজাহ)। ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, অনেক মহীয়সী নারী যেমন খাদিজা (রা.), আয়েশা (রা.), ফাতিমা (রা.) জ্ঞান, সাহস, এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

তাছাড়া, নারীরা সমাজে একজন কর্মজীবী, উদ্যোক্তা, শিক্ষিকা, এবং বিভিন্ন পেশায় নিজেদের অবদান রাখতে পারে। ইসলামে নারীর জন্য কাজ এবং সমাজসেবা করা নিরুৎসাহিত নয়, বরং তা শালীনতার সাথে এবং ধর্মীয় নির্দেশনা মেনে করতে বলা হয়েছে।

ইসলাম নারীকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছে, যেখানে তারা তাদের পরিবার, সমাজ, এবং আত্মিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করতে পারে। ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের জীবনে সম্মান, স্বাধীনতা, এবং নিরাপত্তার ভিত্তি তৈরি করে।

ইসলামের পরিচয় :

ইসলাম আল্লাহপাকের মনোনীত একমাত্র 'দ্বীন', যা একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবনযাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। আরো আছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন এবং সংরক্ষণে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই, হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, 'ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৯)। অন্য একটি আয়াতে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫)।

হাদিস শরিফে ইসলামের একটি সংজ্ঞা ও পরিচিতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘ইসলাম হলো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল বলে সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ শরিফে গিয়ে হজ আদায় করা।’ (বোখারি ও মুসলিম)।

বস্তুত ইসলামই সব নবী-রসুলের অভিন্ন ধর্ম। হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আগমনকারী সব নবী-রসুলই মানুষকে ইসলামের দিকেই আহ্বান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে গড়ে তুলেছেন।

হজরত ইব্রাহীমই (আ.) সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের নাম ইসলাম এবং তার উম্মতকে ‘উম্মাতে মুসলিম’ বলে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কোরআনে বিষয়টিকে আল্লাহপাক তুলে ধরেছেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মাতে মুসলিম অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৮)।
হজরত ইব্রাহীম (আ.) তার সন্তানদের প্রতি অসিয়ত করে বলেন, ‘তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৩২)।

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা আত্নসমর্পণ করা,আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত হওয়া। এ কারণেই এর নাম ইসলাম। ইসলামের আরেকটি শাব্দিক অর্থ হচ্ছে শান্তি। এর তাৎপর্য হল মানুষ তার দেহ ও মনের প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় শুধু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ এবং অনুগত হওয়ার মাধ্যমে। এ ধরনের অনুগত জীবন অন্তরে শান্তি আনে এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত শান্তি। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী যথা বিশ্বাস কর্ম ও উপলব্ধি অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তদানুরুপ কাজের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্কের উপলব্ধি করা।

মুসলিম নারীঃ

পৃথিবীতে যা কিছু মহান চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী অর্ধেক তার নর' । নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বজুড়ে আলোচনা সমালোচনার শেষ নেই। অথচ এই নারীকে মহিমান্বিত কে করেছে তা এখনো অনেক নারী অবগত নন। দুঃখের বিষয়

সেই আদি যুগ থেকে শুরূ করে আজ অবদি নারীরা নানা ভাবে নির্যাতিতা ও নিগৃহীতা হয়ে আসছে । কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর, নারীর সমহরণ, সতীদাহ প্রথা আজও বিবেকবান মানুষকে শিহরিত করে ।

একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের যথাযোগ্য সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীজাতি ধর্মে কর্মে, শিক্ষা সংস্কৃতি, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফিরে পেয়েছে তাঁদের সম্মান মর্যাদা ও অধিকার।

আল কোরআনের দৃষ্টিতে নারীঃ

ক) :-

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, ইবাদতকারী পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও নারী, খোদাভীরুপুরুষ ও নারী, ছদকা দানকারী পুরুষ ও নারী, রোযাদার পুরুষ ও নারিগণ এবং যে সকল পুরুষ ও নারী তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং যে সকল পুরুষ ও নারী আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের সকলের জন্যেই আল্লাহ তা’য়ালার কাছে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার” ।(সূরা আহযাব : ৩৫।)

এই পবিত্র আয়াতে, পুরুষ ও নারীকে পাশা-পাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’য়ালা পুরস্কার দান ও ক্ষমা করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি।

খ) :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“হে মানব সকল! আমরা তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি এ কারণে যে, তোমরা যেন একে অপরকে চিনতে পার (এবং বুঝতে পার বংশ ও গোত্র কোন গর্বের বিষয় নয়)। তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম যে অন্যের থেকে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং মানুষের ভাল ও মন্দ কাজের বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন।(হুজুরাত : ১৩।)

এই পবিত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষ ও নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর ও একক, পবিত্র সত্তাকে উত্তমরূপে জানা বলে উল্লেখ করেছেন। আর বংশ, ক্ষমতা, ধন-দৌলত, জ্ঞান, রং, ভাষা ও ভৌগলিকতার (আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ইত্যাদি) ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের মর্যাদাকে নির্ধারণ করেন নি বরং আল্লাহর কাছে উত্তম বস্তু হচ্ছে তাকওয়া, আর তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মেনে চলা।

গ) :-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"পুরুষ ও নারীদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে এবং উত্তম কাজ আঞ্জাম দিবে, তাদেরকে আমরা পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদের কাজের তুলনায় উত্তম পুরস্কার দান করব"।(নাহল : ৯৭।)

এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা উত্তম কাজের বিনিময় স্বরূপ পুরস্কার ও সওয়াব দানের অঙ্গীকার করেছেন, আর সৎকর্ম সম্পাদনকারী পুরুষই হোক অথবা নারী হোক কোন পার্থক্য করেন নি বরং যে কোন বান্দাই এই ভাল কাজ আঞ্জাম দিবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকেই এই পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

ঘ) :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আল্লাহ্ তা'য়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সহধর্মিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তাদের সান্নিধ্যে প্রশান্তি অনুভব করতে পার, আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও রহমতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সব কিছুই হচ্ছে নিদর্শন তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।"(রূম : ২১।)

এই পবিত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা নারী সৃষ্টিকে তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নারীরা হচ্ছে ভালবাসা, রহমত ও প্রশান্তির কারণ। বিশিষ্ট মুফাসসির আল্লামা তাবাতাবাই (রহ:) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, পুরুষ ও নারী এমনই এক সৃষ্টি একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে যারা উভয়ই পূর্ণতা অর্জন করে এবং এ দু'য়ের মিলনের মাধ্যমে মানব জাতির বংশ বিস্তার ঘটে থাকে, আর তারা একজন অপরজন ছাড়া অসম্পূর্ণ।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতের শেষে বলছেন : এই বিষয়টি তাদের জন্য নিদর্শন যারা চিন্তা করে বা যারা বিবেক সম্পন্ন। তারা এর মাধ্যমে বুঝতে পারবে যে, পুরুষ ও নারী একে অপরের পরিপূরক। আর নারীই একটি পরিবারকে সতেজ ও উদ্যমী করে রাখে

এবং এর সদস্যদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। যে কারণে পুরুষ ও নারী শুভ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ভালবাসা ও রহমত। শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদার কারণেই তারা এ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

কিন্তু পুরুষ ও নারীর বন্ধনের মধ্যে দু'টি দিক বিদ্যমান। তার একটি হচ্ছে ঐশী ও ভালবাসার দিক অপরটি হচ্ছে পাশবিক দিক। তবে মানুষ তার ঐ ঐশী ও ভালবাসার বোধের মাধ্যমেই পূর্ণতায় পৌঁছে থাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি তা হচ্ছে, অনেক মুফাসসির উল্লিখিত আয়াত ও এ ধরনের আরো কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নারী পুরুষের শরীরের অংশ। কেননা তাদেরকে পুরুষের শরীরের অংশ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই ধরনের তফসিরের ফলে অনেক সুবিধাবাদী পুরুষ, নারীদেরকে তাদের থেকে নিম্ন পর্যায়ের মনে করে থাকেন যা নারীর জন্যে একটি অপমান জনক বিষয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহকে তারা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানব সকল! তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে তার সহধর্মিণীকেও এবং ঐ দু'জন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন।(নিসা : ১।)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

তিনিই তোমাদেরকে একক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রী ।(আ'রাফ : ১৮৯।)

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রীকেও।(যুমার : ৬।)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

আর এটা তাঁর নিদর্শনমূহের নমুনা স্বরূপ যে, তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন।(রূম : ২১।)

وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রী নির্দিষ্ট করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে সন্তান ও পৌত্রদের সৃষ্টি করেছেন।(নাহল : ৭২।)

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন।(শুরা : ১১)

বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, প্রথম তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে সমস্ত মানুষ একটি নফস (সত্তা) থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের স্ত্রীগণও ঐ নফস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু পরের তিনটি আয়াতে উক্ত বিষয়টিকে সমস্তপুরুষের প্রতি ইশারা করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের স্ত্রীগণকে তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি আমরা একটুখানি এই বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেই তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাদের স্ত্রীগণ উৎসের দৃষ্টিতে তাদেরই প্রকৃতির, অন্য প্রকৃতির নয়। এটা নিশ্চয় বুঝাতে চাননি যে, স্ত্রীগণ তাদের দেহের অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে বলতে হয় যে, প্রতিটি স্ত্রীই তার স্বামীর দেহের অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী তিনটি আয়াত প্রথম তিনটি আয়াতকে ব্যাখ্যা করেছে, যাতে করে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়।

আল্লামা তাবাতাবাই এই আয়াতের তফসিরে বলেছেন : 'ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা' আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে যে, স্ত্রীদের পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের উভয়েরই সৃষ্টির উৎস হচ্ছে এক।

এই আয়াতে 'মিন' শব্দটি উৎস বর্ণনা অর্থে এসেছে অর্থাৎ এখানে 'মিন' কোন কিছু সৃষ্টির উৎসকে বর্ণনা করছে। এই আয়াতটি অন্যান্য আয়াতের মতই পুরুষ ও নারীর সৃষ্টির উৎস বর্ণনা করেছে, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অতএব, এটা আমাদের কাছে পরিস্কার এবং বিভিন্ন তফসির গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী যে বলা হয়ে থাকে আল্লাহ তা'য়ালা নারীকে পুরুষের বাম পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে দলিলহীন উক্তি।(আল মিযান ফি তাফসিরুল কুরআন, খণ্ড- ৪, পৃ.- ১৩৬।)

উপরোল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণাটির পক্ষে রয়েছেন আহলে সুন্নাতের মুফাসসিরগণ যেমন : ওয়াহ্বাহ্ যুহাইলী এবং ফাখরুদ্দীন রাযি তারা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন ও গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং কোরআনের আয়াত থেকে আমাদের কাছে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে, পবিত্র কোরআন পুরুষ ও নারী সৃষ্টির উৎসগত আলোচনা করেছে এবং তাদের মধ্যকার সাদৃশ্যকে তুলে ধরেছে। এর পক্ষে আমাদের আরো জোরাল যুক্তি রয়েছে যা নিম্নরূপ : ইমাম সাদিক (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন করা হল যে, 'একদল লোক বলে হযরত হাওয়াকে হযরত আদমের বাম পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে' এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

তিনি বললেন : আল্লাহ তা'য়ালা এমন ধরনের কাজ করা থেকে পবিত্র। এরপর তিনি তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন : আল্লাহর কি ক্ষমতা ছিল না যে, হযরত আদমের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করবেন যে তার পাজরের হাড় থেকে হবে না? যাতে করে পরবর্তীতে

কেউ বলতে না পারে যে, হযরত আদম নিজেই নিজের সাথে বিয়ে করেছেন। আল্লাহ তাদের ও আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে ফায়সালা করুন।(ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খণ্ড-২০, পৃ. -৩৫২, বাব- ২৮, হাদীস নং-২৫৮০৪।)

(অর্থাৎ এখানে ইমাম বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ যখন হযরত আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন তবে তার সৃষ্টির জন্য, তার পাজরের হাড় থেকে করতে হবে কেন? যেহেতু আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই এ কথা বললে তাঁর অক্ষমতাকেই তুলে ধরা হয়, নয় কি? -নাউযুবিল্লাহ।)

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে যে, 'আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম সৃষ্টির পরে অবশিষ্ট কাদা-মাটি থেকে হযরত হাওয়াকে (হযরত আদমের মতই) স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন।(বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১১, পৃ. -১১৫, হাদীস নং-৪২।)

ঙ) :-

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

"আমরা মুসার মায়ের প্রতি এরূপ এলহাম করেছিলাম যে, তাকে দুধ দাও এবং যখনই তার ব্যাপারে ভয় পাবে তখনই তাকে (নীল নদের) পানিতে নিক্ষেপ কর, তুমি ভয় করো না ও দুঃখিত হয়োনা আমরা তাকে পুনরায় তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলগণের মধ্যে স্থান দিব"।(কাসাস : ৭।)

এই আয়াতে এ বিষয়টি পরিস্কার যে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর মায়ের প্রতি এলহাম করেছেন, আল্লাহ একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন এটা হচ্ছে নারীদের জন্য একটি মর্যাদার বিষয়।

চ) :-

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّـهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

"(ঐ সময়কার কথাকে স্মরণে আন) যখন ফেরেশতাগণ বলেছিলেন : 'হে মারিয়াম! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে তার পক্ষ থেকে এক বাণীর সুসংবাদ দান করছেন যে, তার নাম হচ্ছে মাসিহ্ ঈসা ইবনে মারিয়াম, সে এই দুনিয়া ও আখেরাতেও একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হবে।"(আলে ইমরান : ৪৫।)

তাহলে আমাদের কাছে এটা পরিস্কার যে, একজন নারীর পক্ষে এটা সম্ভব যে, সে পরিপূর্ণতার এমন পর্যায়ে পৌছাবে, যার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা আসমানী কিতাবে তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবেন। আর আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ ও স্বয়ং জিব্রাঈল (আ.) তাঁর

সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কথা বলবেন। আর এমন নজির পুরুষদের মধ্যেও কম দেখা যায়।

ছ) :-

وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা মু'মিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যখন সে বলেছিল যে, হে আল্লাহ! বেহেশ্তে তোমার কাছে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফিরআউনের কু-কর্ম ও তার অত্যাচারী দলবল থেকে রক্ষা কর"।(তাহরিম : ১১।)

১-আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতে সকল পুরুষ ও নারীর সামনে একজন নারীকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

২-আছিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী) সকল নারীকে এটাই শিক্ষা দিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কোন বাদশাহর প্রাসাদে জীবন-যাপন করার (সেখানে সব ধরনের সুব্যবস্থা থাকা সত্বেও) থেকেও উত্তম। তিনি আরো প্রমাণ করলেন যে, কোন নারীরই উচিৎ নয় এই দুনিয়ার বাহ্যিক রূপের মোহে ভুল করা। কেননা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর শুধুমাত্র আল্লাহ্ই থাকবেন।

৩-তিন আরো শিক্ষা দিলেন যে, নারীদের স্বাধীনতা থাকবে (যতটুকু আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন) এবং তারা জুলুম ও জালিমের প্রতি ঘৃণা রাখবে; যদিও ঐ জালিম তার স্বামীও হয়ে থাকে।

জ) :-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

"হে রাসূল! আমরা তোমাকে অফুরন্ত নেয়ামত -নবুওয়াত, শাফা'য়াতের ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসহ কাউসার (ফাতিমাকে) - দান করেছি। সুতরাং তুমি এই নে'য়ামতসমূহের শুকরিয়া স্বরূপ নামায আদায় এবং কুরবানী কর। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার শত্রুরাই হচ্ছে নির্বংশ।"(কাউছার।)

হাদীসের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

ক) নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদিস :-

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): خیر اولادکم البنات

রাসূল (সা.) বলেছেন : কন্যারাই হচ্ছে তোমাদের উত্তম সন্তান।(মাকারিমুল আখলাক, পৃ. -২১৯।)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): خیرکم خیرکم لنسائه و لبناته

রাসূল (সা.) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের নারী ও কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।(নাহ্জুল ফাসাহাহ্, হাদীস নং-১৫২১।)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):. خیرکم خیر کم لاهله و انا خیرکم لاهلی ما اکرم النساء الا کر□ و لا الا لئیم

রাসূল (সা.) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহার করে থাকে। আমি আমার পরিবারের সাথে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যবহারকারী। কেবল মহান ব্যক্তিরাই নারীগণকে সম্মান দিয়ে থাকেন এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরাই কেবল নারীদেরকে অপমান ও অপদস্থ করে থাকে।(নাহ্জুল ফাসাহাহ্, হাদীস নং-১৫২০।)

রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তির তিনটি (সচ্চরিত্র) কন্যা সন্তান থাকবে অথবা তিনটি (পবিত্র) বোনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব হবে।

রাসূল (সা.) -এর কাছে প্রশ্ন করা হল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দু'টি (সচ্চরিত্র) কন্যা সন্তান অথবা দু'টি (পবিত্র) বোনের ভরণ-পোষণকারীও কি এই ছওয়াব পাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাকেও এই পুরস্কার দেয়া হবে।

আবারও প্রশ্ন করা হল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটি (পবিত্র) কন্যা সন্তান অথবা একটি (পবিত্র) বোনের ভরণ-পোষণকারীও কি এই সওয়াব পাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাকেও এই একই পুরস্কার দেয়া হবে।(মাকারিমুল আখলাক, পৃ. -২১৯।)

قال الصادق (علیه السلام):... اذا آذاها □ یقبل الله صلاته و لا حسنة من عمله و کان اول من یرد النار

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি তার ‑ স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তার নামাযকে কবুল করবেন না এবং তার ভাল ও উত্তম কাজ সমূহকে তার আমলনামায় লেখা হবে না। আর তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার কারণে সে প্রথম ব্যক্তি যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।(আওয়ালিন দানেশগাহ্, হাদীস নং-২০।)

কুরআনে মুসলিম নারীর চিত্র

নারী তার স্বামীর ঘরের কর্তী আর সংসারের যাবতীয় বহুমুখী কার্যক্রমের দায়িত্ব স্বামীর উপর। সন্তানদের লালন-পালন, ঘর সামলানো, সংসারের শৃংখলা বিধানও সম্পদের

হেফাযত নারীর উপর অর্পিত। জীবিকা উপার্জন থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় বহির্মুখী দায়িত্ব স্বামীর উপর। অন্তর্মুখী কার্যক্রমই নারী স্বভাবের সংগে সামঞ্জশীল, লাজলজ্জা তার অলংকার। পর্দা তার ভূষণ। মসজিদে গিয়ে নামায পড়া তার জন্যে ফরয নয়। ঘরের নামাযই তার জন্যে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মসজিদে গেলেও তাদের পুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে পিছনে দাঁড়াতে হয়। তাদের জন্যে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার নিয়ম আলাদা। নামায সেরে পুরুষদের আগেই তাদের মসজিদ ত্যাগ করতে হয়। রাস্তার মাঝখান দিয়ে নয়, বরং রাস্তার পাশ ঘেষে তাকে পথ চলতে হয়। ঘর থেকে বের হবার সময় তাকে ভালোভাবে শরীর ঢেকে পর্দা করে বের হতে হয়। সে ঝকঝকে পোষাক আর ঝনঝনে অলংকার পরিধান করে রাস্তায় বের হবেনা। উগ্র সেন্ট লাগিয়ে চলবেনা। মুহাররাম পুরুষ সাথে না নিয়ে সে সফর করবেনা। সে তার অংগ-প্রতঙ্গ, অলংকার ও ভূষণ প্রদর্শন করবেনা। অমুহাররামদের সাথে কথা বলবেনা। প্রয়োজন পড়লে শক্ত ভাষায় কথা বলবে, আলতো ভাষায় বলবেনা। শরীর দেখা যায় এমন সুক্ষ্ম কাপড় পরবেনা।

এগুলো হচ্ছে, সে সব হিদায়াত যা একটি ইসলামী সামজে নারীদের কর্তব্য কাজ হয়ে থাকে। মুসলিম নারী তার জীবনকে এ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নেবে। এসব হিদায়াতের পূর্ণাংগ আনুগত্য করেই সে তার ঈমানী দায়িত্ব পালন করবে।

একজন নেক স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সঞ্চয় করা সর্বোত্তম সামগ্রী কি-আমি কি তোমাদের তা বলবো? -তা হচ্ছে-নেক স্ত্রী। অতঃপর তিনি নেক স্ত্রীর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন এভাবে:

"তার প্রতি তাকালে স্বামী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। স্বামী কোনো কাজের আদেশ করলে সে আন্তরিকতার সাথে তা পালন করে। স্বামী বাইরে গেলে সে স্বামীর ঘর, সন্তানাদি ও নিজ ইয্যত আবরুর পূর্ণ হিফাযত করে।"

মোট কথা ইসলামী অনুশাসনই একজন নারীকে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করে দেয়। একজন প্রকৃত মুসলিম নারী স্ত্রী হিসেবে আদর্শ স্ত্রী ও বিপদে মুসীবতে সে সবর করে থাকে। স্বামীর দুঃখ-কষ্টে সে একজন পরম ধৈর্যশীল বন্ধু হয়ে থাকে। প্রাচুর্যে তার মধ্যে

কোনো অহংকার থাকেনা বরঞ্চ সে মহান মালিকের প্রতি বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। একজন মুমিন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর প্রতি তার অসংখ্য দায়িত্ব কর্তব্য হয়ে থাকে। আর ইসলামে এ দায়িত্ব পালন তার জন্যে বড়ই মর্যাদাকর। ইসলামে নেক স্ত্রীর মর্যাদা এখান থেকেই বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর জন্যে যা কিছু খরচ করে এমনকি স্ত্রীর প্রতিটি লোকমা স্বামীর জন্যে ইবাদত বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। আর এটা হচ্ছে সবর, শোকর ও ইসলামী অনুশাসনের প্রতি তার আনুগত্যের বিনিময়।

কন্যা হিসেবেও এখানে সে একজন অনুগত আদর্শ কন্যা হয়ে থাকে। সে তার পিতা-মাতার প্রতি অশেষ মহ্ব্বত পোষণ করে। ভাই বোনদের প্রতি স্নেহময়ী হয়ে থাকে। সে মায়ের কাজে সহযোগিতা করে আর পিতার চক্ষু করে শীতল। এমন দু'টি কন্যাকে লালন-পালন করে বিয়ে-শাদী দিয়ে নেক স্বামীর ঘরে যে পিতা-মাতা পৌঁছে দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। মা হিসেবেও সে আদর্শ মা হয়ে থাকে। তার আদর যত্ন ও ভালোবাসা সন্তানের জন্যে দুনিয়াতে সবচাইতে বড় নিয়ামত হয়ে থাকে। সে বিনিদ্র রজনী জেগে সন্তানের লালন-পালন করে। পরম আন্তরিকতার সাথে সে এ কাজ করে থাকে। নিজে ভিজা স্থানে শুয়ে সন্তানকে শুষ্ক স্থানে শুতে দেয়। শরীরের রক্ত নিংড়িয়ে সে সন্তানকে দুধ পান করায়। সন্তানের জন্যে সে চরম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করে।

কুরআন মজীদে ঈমানদার নারীর বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর চিত্র অংকিত হয়েছে। এসব গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে একজন ঈমানদার নারী দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। নিম্নে এরূপ কতিপয় গুণাবলীর উল্লেখ করা হল:

১. মুসলিমাত مُسْلِمَاتٍ: অর্থাৎ তারা আল্লাহর একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত। সর্বক্ষণ তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র অসন্তোষ থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় নিরত থাকে।

২. মু'মিনাত مُؤْمِنَاتٍ: তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার। তাদের ঈমানের উপর তারা অটল অবিচল। আর তাদের আমল তাদের ঈমানেরই প্রতিবিম্ব।

৩. কানিতাত قَانِتَاتِ: জীবনের প্রতিটি কাজে তারা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীলা। তাঁকেই প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখে।

৪. সাদিকাত صَادِقَاتِ : তারা স্পষ্ট ভাষিণী ও সত্যবাদিনী হয়ে থাকে। মিথ্যা থেকে তাদের যবান সুরক্ষিত।

৫. সাবিরাত صابرات: কঠিন অবস্থায়ও তারা হকের উপর অটল অবিচল থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর তারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে।

৬. খা-শিআত خاشعات : তারা খোদার সম্মুখে ভীত অবনত। তারা তাঁর মর্জির খেলাপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনা।

৭. মুতাসাদ্দিকাত مَتَصَدِّقَاتِ : তারা নিজেদের সম্পদ থেকে দান করে থাকে। মিসকীন ও নিকটাত্মীয়ের হক তারা আদায় করে। তারা সব সময় দান খয়রাতে অভ্যস্ত।
৮. সায়িমাত صَائِمَاتٍ : তারা রোযাদার হয়ে থাকে। ফরয রোযা ছাড়াও তারা নফল রোযা রাখে।

৯. হাফিযাত حافظات: তারা পুত চরিত্রের হয়ে থাকে। তারা নিজেদের পবিত্রতা ও ইয্যত আবরুর সংরক্ষণকারিণী

১০. যাকিরাত ذاكرات : খোদার স্মরণে সর্বদা সিক্ত থাকে তাদের অন্তর ও যবান। তাঁরই উপর তারা ভরসা করে থাকে।

১১. মুহছিনাত مُحْسِنَاتٍ : তারা নিষ্পাপ, পরহেযগার ও নেককার হয়ে থাকে। তারা পরিচ্ছন্ন প্রাণ ও সরলমনা হয়ে থাকে।

১২. মুহসিনাত حْسِنَاتِ সৎকর্মে তারা উদ্দীপনাময়ী হয়ে থাকে। তারা অধিক সৎকাজ করে থাকে।

ইসলাম পূর্ব যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারী অবস্থানঃ

ইহুদি ধর্মে

ইহুদি ধর্ম কন্যা বা নারী সম্বন্ধে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম হচ্ছে এই, 'পুরুষ সৎকর্মশীল ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট, আর নারী ভণ্ড ও বদস্বভাবের। পৃথিবীর প্রথম মানব আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম চির সুখের স্থান জান্নাতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলেন। তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করেন।''

ইহুদি ধর্মমতে, নারীর ওপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। নারীর কারণে সবার ধ্বংস অনিবার্য। এ ধর্মে সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরি ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো না। কারণ নারী মানুষরূপে গণ্য হতো না। নারী ছিল উপেক্ষার পাত্র।

খ্রিষ্টধর্মে

পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিষ্টধর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এ ধর্মে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত ও নিগৃহীত। খ্রিষ্টানরা নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো, আদম আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী হাওয়ার ভুলের কারণে সকল নারীর রক্তে পাপের সঞ্চালন ঘটেছে। খ্রিষ্টান পাদ্রিরা নারীকে নরকের দ্বার এবং মানবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ মনে করতো। তারা নারীকে সর্বাপেক্ষা জঘন্যরূপে চিত্রিত ও নিকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করতো।

খ্রিষ্টসমাজ নারীকে আত্মাহীন প্রাণী ও সন্তান উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছে। তাদের ধারণা, ঈসা আলাইহিস্ সালামকে শুলবরণ করতে হয়েছে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই। খ্রিষ্টান পাদ্রিদের মতে, "নারী যাবতীয় পাপের উৎস। নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল এবং তারা আল্লাহ তাআলার মান সম্মানে বাধা দানকারী।"

সপ্তম শতাব্দীতে এক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: "নারীর কোনো আত্মা নেই" খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত। নারী জাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, "পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা

অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনান্তে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।”

সেন্ট টমাস ঘোষণা করছেন, “নারী ঘটনাক্রমে সৃষ্ট একটি জীব। এটা জেনেসিস প্রতীকী হয়েছে, সেখানে হাওয়াকে আদমের একটি হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।”

খ্রিষ্টান এক পাদ্রি বলেছেন, “নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী। ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয় সব তারই কারণে। আর এ কারণেই তারা নারীর শিক্ষা অধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।”

মেরি-ওলস্টোনক্রাফট উল্লেখ করেন, “রুশো থেকে শুরু করে ড. গ্রেগরি পর্যন্ত যারাই নারীর শিক্ষা ও আচরণ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তারা নারীকে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে, নারীর স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষমতা নেই। পুরুষের মধু সাথী হিসেবেই তাকে ভালো মানায়। আনুগত্য তার প্রধান গুণ। পুরুষের তুলনায় নারীর এই দুর্বলতা প্রাকৃতিক ব্যাপার।” রুশোর এসব ধারণাকে ননসেন্স বলেছেন মেরি।

গ্রিক সভ্যতা

গ্রিকরা নারীদের সম্পর্কে বলত: “নারী জাতি সব অকল্যাণের মূল।” গ্রিক সভ্যতার যুগে নারীকে দুর্বিষহ মানবেতর দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। গ্রিক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিস এবং এন্ডারস্কির ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সক্রেটিস বলেন, ‘নারী বিশ্বজগতের বিশৃঙ্খল ও ভাঙনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুইপাখি তা ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।’

গ্রিক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এন্ডারসকি বলেন: “অগ্নিদগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।”

গ্রিক সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামত বিবেচনাযোগ্য ছিল না। নারীকে তার অভিভাবকের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হতো।

রোমান সভ্যতা

বিশ্বের প্রাচীনতম রোমান সভ্যতায় নারীর আইনগত কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীরা সামাজিক, নৈতিক তথা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। রোমান সমাজে

মেয়ে সন্তানকে আজীবন পিতার অনুগত হয়ে থাকতে হতো। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার ওপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত। পুরুষদের যৌনক্ষুধা নিবারণের হাতিয়ার হিসেবে নারী ব্যবহৃত হতো। এমনকি স্বামী কোনো অপরাধের দায়ে স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতো।

চীনা সভ্যতা

মিঃ স্ট্রেচি প্রাচীন চীনে নারীর অবস্তান জানাতে গিয়ে লেখেন, সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীনে নারীর অবস্থা ও অবস্থান খুব ভালো ছিল না। ছোট্ট ছোট্ট নারী শিশুদের পায়ে বেড়ি-কাঠ বা লোহার জুতো পরানোর প্রথার উদ্দেশ্য ও ছিল তাদেরকে দূর্বল ও শক্তিহীন করে রাখা। এই প্রথা যদিও সমাজের উচ্চ শ্রেণী ও বিত্তবানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু এর দ্বারা আসমানী হুকুমতের প্রাক্কালে নারীদের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে অনেকটাই আঁচ করা যায়।

হিন্দু ধর্মে নারী

পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এ ধর্ম বৈদিক ধর্ম, আর্যধর্ম, সনাতন ধর্ম ইত্যাদি নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্মে নারীর কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ 'মহাভরত'-এ বলা হয়েছে, "নারী অশুভ, সকল অমঙ্গলের কারণ, কন্যা দুঃখের হেতু।" বেদে উল্লেখ রয়েছে, "যজ্ঞকালে কুকুর, শুদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না।" হিন্দু ধর্মে নারীকে কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়নি।

ভারতীয় সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের নারীদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষদের কাছে হতে দূরে রাখা হতো। কারণ, তাদের মতে, সব ধ্বংসের মৌল উৎস ছিল নারী। বৈদিক যুগে নারী ছিল যুদ্ধলব্ধ লুটের মালামালের মতো। যুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদের অপহরণ করতো এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর মতো তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতো। তৎকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করতো। কন্যাসন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতো। স্বামীর ব্যভিচার, পতিতাগমন, এমনকি মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতীয় সমাজে কন্যাসন্তান জন্ম

নেয়া যেমন অপরাধ ছিল, তেমনি গোটা সমাজে নারী ছিল ব্যবহার সামগ্রী সদৃশ। মানুষ হিসেবে নারীর ছিল না কোনো মানবাধিকার।

হিন্দুস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'মনু সংহিতা'য় পিতা, স্বামী কিংবা দু'জনের মৃত্যুর পর পুত্রহীন নারীর স্বতন্ত্র-ব্যক্তিগত কোনো অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আর পিতা, স্বামী ও পুত্র; এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোনো এক পুরুষ-আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক ছিল। সে কোনো অবস্থাতেই তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল না। জীবিকার ক্ষেত্রে তার অধিকার-বঞ্চনার চাইতেও বেশি নির্মম ছিল স্বামীর বিয়োগপরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের সামাজিক অস্বীকৃতি। সমাজ মনে করত স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর দিন 'সতীদাহ'ই (স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা) ছিল এমন নারীর অবধারিত নিয়তি। এই প্রাচীন রীতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির মুখে এর বিলুপ্তি ঘটে ।

বৌদ্ধধর্ম

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি এবং কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মে নারী ততটা অবহেলিত নয়। মহামঙ্গল সূত্রে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে উত্তম মঙ্গল বলে আখ্যায়িত করেন। জানা যায়, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যাসন্তান প্রসব করলে রাজা বিমর্ষ হন। আর বুদ্ধ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "কন্যাসন্তানের জন্মহেতু কারো দুঃখ করা উচিত নয়। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণ কন্যা হলে সে পুত্র অপেক্ষা শ্রেয় হয়।"

উপযুক্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্মের কোন একটিতেও কন্যা বা নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারী যে একটি প্রাণী, পুরুষের মতো তারও প্রাণ আছে তা উপরে বর্ণিত কোনো ধর্মই স্বীকার করতো না। নারীকে গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের মতো মনে করা হতো।

আরব সমাজ

ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে কন্যাসন্তানের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান খারাপ ছিল। কন্যারা ছিল ঘৃণিত, মর্যাদাবহির্ভূত এবং অধিকার ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে গণ্য ছিল না। কন্যাসন্তান জন্মানো চরম অভিশাপ বলে গণ্য করা হতো। কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর পর্যন্ত দেয়া হতো। ভোগ্যপণ্যের চেয়ে অবমূল্যায়িত ছিল নারী। এককথায় কন্যারা সে সমাজে ছিল শোষিত, অধিকারবঞ্চিত এবং শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের কোনো সুযোগই তারা পেত না।

ইংল্যান্ডে নারী:

মিঃ স্ট্রেচি ইংল্যান্ডে নারীর অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন সেখানে নারীকে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। তার জন্য শিক্ষার দরজা বন্ধ ছিল। নিম্ন শ্রেণীর কিছু কাজকর্ম ছাড়া নারী ভালো কোন পেশায় নিযুক্ত হতে পারতো না। বিবাহের সময় তার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো। বলা হত মধ্যযুগ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত নারীকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এর চেয়ে ভালো কিছু তখন আশা করা যেত না

ইসলাম ধর্মে নারীঃ

আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন-

إني جاعل في الأرض خليفة

পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই। (সূরা বাকারা (২) : ৩০)

তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু একজন পুরুষ (বা হযরত আদম আ.)কে সৃষ্টি করার ঘোষণা ছিলো না, বরং নর ও নারী সম্মিলিতরূপে যে 'মানব' সেই মানব সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো।

অর্থাৎ সেটা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ের সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। কারণ পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ও খেলাফত শুধু পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিলো না। আদমের খেলাফতে হযরত হাওয়ার ভূমিকা ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য। জান্নাতে আমাদের বাবা হযরত আদম (আ.)কে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন নিজের মধ্যে তিনি একটি শূন্যতা, একটি অভাব এবং অশান্তি অনুভব করছিলেন।

তিনি যখন ঘুমুলেন তখন তাঁর বামপার্শ্বের অস্থির ঊর্ধ্ব-অংশ থেকে প্রথম নারী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। কেন? আদম যেন তাঁর সঙ্গ দ্বারা সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করেন। বস্তুত পৃথিবীর প্রথম নারী ছিলেন প্রথম পুরুষের জন্য স্রষ্টার পক্ষ হতে জান্নাতের চেয়েও মূল্যবান উপহার। কারণ জান্নাত তার অফুরন্ত নায-নেয়ামত সত্ত্বেও আদমের অন্তরের শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা,

অভাব ও অশান্তি দূর করতে পারেনি। একা একা জান্নাত ভোগ করে আদমের অন্তরে শান্তি আসেনি। হযরত হাওয়াকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার পরই আদমের কাছে জান্নাত জান্নাত মনে হয়েছিলো। জান্নাতের বাগানে দু'জনের এই যে শান্তির সম্পর্ক, এটা শুধু ঐ দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ের সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها

তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি 'নফস' থেকে এবং বানিয়েছেন তার থেকে তার জোড়া যেন সে তার কাছে স্বস্তি লাভ করে। (সূরা আরাফ : ১৮৯)

সুতরাং বোঝা গেলো, পৃথিবীর প্রতিটি স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। এজন্যই আল্লাহর নামকে মাধ্যম করে এবং মোহর আদায় করে একটি জান্নাতি উপহাররূপেই নারীকে গ্রহণ করতে হয়। আর এজন্যই বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله

আর তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানতরূপে, আর তোমরা তাদের 'লজ্জাস্থান'কে হালাল করেছো আল্লাহর কালিমাকে মাধ্যম করে।' (সহীহ বুখারী ১/৩৯৭)

পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা

নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত সম্পর্ক বিষয়ে অনেকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন যে সমান গুরুত্ব সত্ত্বেও প্রকৃতির ভিন্নতায় যার সম্পর্ক রাত-দিনের মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন : 'হে নারী সমপ্রদায়, তোমরা বেশি বেশি সদকা করো। কেননা, আমি তোমাদের বেশি জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি।' মহিলারা বললেন, কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, 'তোমরা অধিকহারে অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অকৃজ্ঞতা দেখাও। বুদ্ধিমান পুরুষকে নির্বুদ্ধি বানাতে অল্প বুদ্ধি ও খাটো দীনদারির আর কাউকে তোমাদের চেয়ে অধিক পটু দেখিনি।' তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জ্ঞান ও দীনের অল্পতা কী? তিনি বললেন, 'মহিলাদের সাক্ষী কি পুরুষদের সাক্ষীর অর্ধেক নয়?' তাঁরা বললেন, জী, হ্যা। তিনি বললেন, 'এটিই তাদের জ্ঞানের অল্পতা। যখন তাদের মাসিক শুরু হয় তখন কি তারা নামায ও রোজা বাদ দেয় না?' তাঁরা বললেন, জী, হ্যা। তিনি বললেন, 'এটিই তাদের দীনদারির স্বল্পতা।

এ বক্তব্যের প্রেক্ষাপট হলো, সেটি ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইছিলেন তাঁদেরকে সদকা দানে উদ্বুদ্ধ করতে। বাস্তবে এটি ছিল এমন কথা বলে হাস্য-কৌতুক করার আদর্শ সময়, যা আংশিক সত্য। তা হলো, কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষী পুরুষের সাক্ষীর অর্ধেকের মর্যাদা রাখে এবং মাসিক অবস্থায় তাদের নামায পুরোপুরি ক্ষমা করা হয় আর রমজানের রোজা অন্য সময় আদায় করতে হয়। দোষের ক্ষেত্রে গুণ বলে এখানে কৌতুক করা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানে ও দীনে কম হলে কী হবে বুদ্ধিমান পুরুষকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে ছাড়ে!

পক্ষান্তরে জাহান্নামে তাদের সংখ্যা বেশি হওয়া- তা তো স্বাভাবিক। কেননা, বাস্তবে তাদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া অন্য কারণও তো রয়েছে। এদিকে স্বামীর অকৃজ্ঞতা তারাই বেশি প্রদর্শন করে থাকে। আসলে এটিই তো আবেগী মনের অপরিহার্য দাবি। যাহোক স্বাভাবিকভাবে ইসলামে পুরুষের মর্যাদার তুলনায় নারীর মর্যাদা তিন রকম :

ক. নারী যেসব অবস্থায় পুরুষের সমান :

ইসলামে নারিকে পুরুষের সহোদরা বানিয়েছে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ইরশাদ করেছেন) এবং নারী-পুরুষকে একে অপরে শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা যেমন ইরশাদ করেন: 'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে।'

আল্লাহ তা''আলা আরও বলেন: 'পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: 'যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।'

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।'

আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস- সালামের জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনার রেশ ধরে ইসলাম নারীর ওপর অর্ধেক দায়িত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে এভাবে: 'আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে স্খলিত করল। অতঃপর তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, 'তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ'

এ ব্যাপারে বরং পুরুষই বড় দায়িত্ব বহন করে। কেননা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার হাতে। পবিত্র কুরআনই সে ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে: 'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?' অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেল। তখন তাদের উভয়ের সতর তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল'।

খ. যেসব অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে ভিন্ন :

ইসলাম একজন মাতাকে পিতার চেয়ে বেশি হক দিয়েছে । যেমন সৌদি আরবে সরকারি চাকরিজীবি মায়েদের জন্য বার্ষিক ছুটির অতিরিক্ত প্রসবকালীন ছুটি হাদীসে বর্ণিত নিফাসের মেয়াদ অনুযায়ী কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ দিন দেয়া হয়। তেমনি তাকে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত মেয়াদ অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে বার্ষিক ছুটির অতিরিক্ত প্রায় একশ

দিনের বিশেষ ছুটি দেয়া হয়। অথচ পুরুষদের জন্য এ ধরনের কোনো ছুটির ব্যবস্থা নেই। একইভাবে ইসলাম নারীদের জন্য সোনা ও রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। পুরুষের জন্য দেয়নি। নারীদের মাসে প্রায় এক সপ্তাহ এবং বছরে প্রায় একমাস সালাত মাফ করা হয়েছে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে করা হয়নি।

শুধু তাই নয়, নারীদের প্রতিপালনে ইসলাম যে মর্যাদা রেখেছে পুরুষদের জন্য তা রাখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 'তোমাদের যে কারও যদি তিনজন কন্যা বা বোন থাকে আর সে তাদের সুন্দরমত দেখাশুনা করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন: 'তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'

এ হাদীসে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারকে পুরুষের চারিত্রিক মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এখন আমরা কি বলবো যে ইসলাম পুরুষের বিপক্ষে বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে?

গ. পুরুষের কিছু যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য :

পুরুষের ওপর ইসলাম পরিবারের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছে এবং উত্তরাধিকারে তার অংশ বেশি দিয়েছে। কারণ, নারীর ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে। আর কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষীকে পুরুষের অর্ধেক গণ্য করেছে। বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যা নারীকে দেয়া হয়নি। পুরুষের ওপর পরিবারের আর্থিক ভার ন্যস্ত করা হয়েছে। পরিবারের মৌলিক অর্থিক খাতগুলো তাকেই সামলাতে হয়। আর তাকেই নিযুক্ত করা হয়েছে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক।

আমরা দেখতে পাই, ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে একইরকম অধিকার দিয়েছে। পাশাপাশি উভয়ের আলাদা বৈশিষ্ট্যও রেখেছে। এভাবেই ইসলাম উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করেছে। তবে এ সমতা দিনের সঙ্গে দিনের কিংবা রাতের সঙ্গে রাতের সমতার মতো নয়। বরং তা গুরুত্বের দিক দিয়ে রাত ও দিনের সমতার মতো। যেমন আদর্শ জীবন কিছুতেই উভয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর যেমন একটি দিবস রাত বা দিনের কোনোটির প্রয়োজনকেই উপেক্ষা করতে পারে না।সাধারণভাবে আমরা যখন ইসলাম নিয়ে আলোচনা করি, তখন ইসলাম ও ইসলাম অনুসারী তথা মুসলিমদের আচরণের মধ্যে পার্থক্য মাথায় রাখা উচিত। ইসলাম ও মুসলিম দুটি ভিন্ন জিনিস।

কেননা মুসলিম অনেক সময় ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। মুসলিম নারীমাত্রেরই উচিত, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি না জানিয়ে ইসলাম তাকে যে অধিকারগুলো দিয়েছে তা দাবি করা। কেননা, সমানাধিকার নিতে গেলে ইসলাম প্রদত্ত অনেক প্রাকৃতিক অধিকারও তাকে হারাতে হয়।

নারীর অবাস্তব সমানাধিকারের দাবিদাররা যার গান গায় আমরা যদি সেই ফরাসি বিপ্লবের নথিপত্র এবং গণতান্ত্রিক দেশসহ বহু দেশের সংবিধান ঘেঁটে দেখি, তাহলে দেখবো অনেক ক্ষেত্রেই তারা নারীর সেই অধিকারগুলোর স্বীকৃতি মাত্র সেদিন দিয়েছে, ইসলাম যা প্রতিষ্ঠা করেছে চৌদ্দশ বছর আগে! শুধু তাই নয়, বরং অনেক অধিকার এমনও আছে যার স্বীকৃতি আজো তারা দেয়নি। যেমন পরিবারে নারীর আর্থিক দায়িত্ব ক্ষমা করা এবং তাকে যাবতীয় অর্থনৈতিক ভার থেকে অব্যহতি দেয়া ইত্যাদি।

সুতরাং এসব বাস্তবতা সম্পর্কে অবগতির পরও কি কোনো জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম রমণী ইসলামের দেয়া তার অধিকার ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে অবজ্ঞা করে পশ্চিমাদের নারীদের তথাকথিত অধিকার দাবি করবেন?

নারীর উত্তরাধিকার

পূর্বে যে প্রাকৃতিক বাস্তবতার কথা আলোচিত হয়েছে তা থেকে অগ্রসর হয়ে পরিবারের জীবনোপকরণ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত করেছে ইসলাম পুরুষের কাঁধে। পুরুষের স্ত্রী-সন্তান, অক্ষম পিতা-মাতা কিংবা কামাইয়ের অযোগ্য ভাই অথবা দায়িত্ব নেয়ার কেউ নেই এমন বিবাহিত বোন হোক- সবার রুটি-রুজির দায়িত্ব তার ওপর। পক্ষান্তরে এ সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব নারীর ওপর দেয়া হয়নি। এমনকি তার পিতা-মাতা বা যারা তাকে ছোট থেকে প্রতিপালন করেছেন- তাদের কারো দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত করা হয়নি। উদারণত এ জন্যই ইসলাম মুসলিমকে অনুমতি দেয় না তার সম্পদের যাকাত আপন স্ত্রী বা সন্তানদের দিতে। কেননা, তাকে নিজের দায়িত্বের অংশ হিসেবেই তাদের প্রয়োজন পুরো করতে হবে; সদকার অংশ থেকে তাদের ওপর খরচ করবে কেন। এ কারণে যাকাত কেবল সীমিত কয়েকটি খাতেই ব্যয় করতে হবে; এর বাইরে কোথাও ব্যয় করা যাবে না। এসব খাত হয়তো হকদার ব্যক্তির সমস্যা স্থায়ী বা সাময়িকভাবে দূর করবে অথবা উচ্চতর কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 'নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার

ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'

তাছাড়া নারীরা তাদের সঞ্চিত সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন- চাই তার মালিক হন বিয়ের আগে কিংবা পরে। উপরন্তু তিনি আপন স্বামীকে তার নিজস্ব সম্পদের তত্ত্বাবধায়কও নিযুক্ত করতে পারবেন। ইসলাম এ জন্য বিবাহপূর্ব ও বিবাহপরবর্তী সময়ে তার স্বতন্ত্র আইনী সত্তা সংরক্ষণেরও নিশ্চয়তা দিয়েছে। সুতরাং বিয়ের আগে মেয়েরা যেমন তার পিতার পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, বিয়ের পরও তার অবস্থা তেমনি। বিয়ের পর তার গোত্রনামে কোনো পরিবর্তন আসবে না। যেমনটি প্রচলিত বস্তুগতভাবে সভ্য অনেক সমাজে। সেখানে বিয়ের আগে মেয়েরা গোত্রের নামে পরিচিত হয় আর বিয়ের পর সমাজ বা আইন তাকে স্বামীর বংশ পরিচয়ে অধিকার দেয়। যেন বিয়ের পর তার মালিকানা পিতার পরিবার থেকে স্বামীর পরিবারে স্থানান্তরিত হয়েছে!

আমরা যদি সূরা নিসার একাদশ আয়াত নিয়ে গবেষণা করি, তাহলে দেখতে পাই পুরুষকে পৈতৃক সম্পত্তিতে বেশি দেয়া হয়েছে তার কিছু দায়িত্ব ও কল্যাণের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে। যখন সরাসরি এ দায়িত্ব চলে যাবে, তখন অতিরিক্ত অংশটুকুও চলে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিস হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

আয়াতে দেখা গেল একমাত্র মেয়ে তার পিতার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণি হয় আর অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পত্তির অংশীদার হয় নারী-পুরুষ উভয়ে অথবা দুই মেয়ে থাকলে তারা পিতামাতার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হয় আর অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বণ্টিত হয় নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে। অতএব মীরাস বা উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত হয় দায়িত্বের স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত আত্মীয়তার স্তর অনুপাতে। আর সাধারণত এই

উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানা লাভের একমাত্র উপায় হয় না। বরং তা একমাত্র উপায় হওয়া সমীচীনও নয়, মানুষ যার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নারী-পুরুষ দুই শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে এমনসব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছেন, একটি সমাজের জন্য যার কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া তাদের প্রত্যেককে জ্ঞান ও ব্যক্তিগত অর্জনের সুযোগও দান করেছেন। তবে যে ব্যক্তি অক্ষম, তার ভার অর্পণ করেছেন সমাজের সুস্থ অংশের ওপর। এজন্যই তার সম্পদে ওই অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি অংশ রেখেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ফরজকৃত যাকাত। তদুপরি তাদেরকে অতিরিক্ত সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা সমাজে নারী যদি পৈত্রিক সম্পদে সমানাধিকার চায়, তাহলে তা সে তখনই পাবে যখন সে পুরুষের সঙ্গে পরিবারে সমান দায়িত্ব পালন করবে। এর বিনিময়ে তার সম্পদে বিশেষত মানব রচিত আইনে তার তালাকের পর বিচ্ছেদের সময় তার সম্পদ নারী-পুরুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সম্পদ সঞ্চয়ে অনেক ক্লেশ সহ্য করেছে অথবা সে মাত্রই এ সম্পদ অর্জন করেছে আর তার স্বামী এ সম্পদ অর্জনে কোনোভাবেই কোনো অবদান রাখেনি।

ইসলামে নারীর ভূমিকাঃ

সভ্যতা বিনির্মানে আদিকাল থেকে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সভ্যতার পূর্ণতায় নারীর অবদান অনস্বীকার্য। নিচে আমরা ইসলামে নারীর বিভিন্ন অবদান খতিয়ে দেখবঃ

ক) পরিবার গঠন ও রক্ষায় নারীর ভূমিকাঃ

নারীরা মূলত চারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেগুলো হচ্ছে:

১. সন্তানধারণ

২. সন্তান প্রতিপালন

৩. স্বামীপ্রীতি

৪. সর্বদা গৃহে অবস্থান

গর্ভধারণ :

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, সন্তান গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীরা সমাজ-সুরক্ষা করে থাকে। কেননা তারা গর্ভধারণ না করলে সমাজ ধীরে ধীরে মানবশূন্য হয়ে বিরান হয়ে যাবে। পশ্চিমাবিশ্বের কিছু দেশের ক্রমহ্রাসমান জন্মহার এর চাক্ষুষ প্রমাণ। তাদের নারীরা

সঠিক হারে গর্ভধারণ না করার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। গর্ভধারণের মাধ্যমে নারীরা এভাবে মানবসমাজসুরক্ষা করে থাকে।

সন্তানপ্রতিপালন:

সন্তানপ্রতিপালনের মাধ্যমেও তারা এ সুরক্ষা-কর্ম আনজাম দিয়ে থাকে। কেননা সন্তানপ্রতিপালন না করলে ভূমিষ্ঠ সন্তান যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তা বলাইবাহুল্য। যাবতীয় বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য নারীরা সন্তান প্রতিপালন করে থাকে।

স্বামীপ্রীতি :

এক্ষেত্রেও সুরক্ষার বিষয়টি পাওয়া যায়। এ বইয়ের 'তৃতীয় দায়িত্বপালনে ত্রুটি: মানসিক ব্যাধি ও আত্মহত্যা' শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানো হবে যে, নারীরা স্বামীপ্রীতির দায়িত্ব পালন না করলে পুরুষজাতির মারাত্মক মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি একারণে তারা আত্মহত্যাও করে বসতে পারে। স্বামীপ্রীতির মাধ্যমে নারীরা পুরুষদেরকে এ মারাত্মক বিপদের হাত থেকে সুরক্ষা করে থাকে।

সর্বদা গৃহে অবস্থান :

প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া ছাড়া বাকি সময় নারীরা ঘরে অবস্থান করার মাধ্যমে সুরক্ষা-কর্ম আনজাম দিয়ে থাকে। কেননা তারা ঘর ছেড়ে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে বের হলে যেমন পরিবারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে তেমনিভাবে নৈতিকভাবেও সমাজ চরম অবক্ষয়ের শিকার হবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রিক, রোমান সভ্যতা এবং অধুনা ধ্বংসপ্রায় পশ্চিমা সভ্যতার পতন-ট্রাজেডি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। নারীরা ঘরে অবস্থান করে মূলত আমাদের সমাজ-সুরক্ষার এ মহৎ কাজ আনজাম দিচ্ছে

খ) মানব সভ্যতা বিনির্মাণ এ নারী জাতির অবদানঃ

মানব সভ্যতা বিনির্মাণ এবং গতিশীলতা রক্ষায় নারীরা নিম্নোক্ত চারটি ধাপে বিশ্ব সভ্যতায় অবদান রেখে থাকেঃ

১। সভ্যতার জন্মদান

২। সভ্যতার বিকাশ

৩। সভ্যতার গতিসঞ্চার

৪। সততার সংরক্ষন

সভ্যতার জন্মদান

মানবসভ্যতার মূল উপাদানই হল মানুষ। আর এ মানুষেরই আগমন ঘটে নারীজাতির মাধ্যমে। নারীরা প্রতিটি মানবশিশুকে দীর্ঘ দশ মাস বহুকষ্টে গর্ভে ধারণ করে। এ সময় শিশু গর্ভধারণকারী মায়ের খাদ্য-খাবার দ্বারা পরিপুষ্ট হতে থাকে। মায়ের নাড়ির সাথে তার নাড়ির সরাসরি সংযোগের ফলে মায়ের যাবতীয় খাদ্য তার শরীরে শক্তিসঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে গর্ভস্থিত শিশু শুধু মায়ের খাদ্য-খাবার দ্বারাই পরিপুষ্ট হয় না; বরং সে এর পাশাপাশি মায়ের চিন্তাচেতনা দ্বারাও পরিপুষ্ট হতে থাকে। মায়ের যাবতীয় ভাবনা ও চিন্তাচেতনা তার মানসিক ও বুদ্ধির বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।)

গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি কীভাবে মানবশিশুর মেধা ও মননের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে থাকে—সামনে আমরা এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাতের প্রয়াস পাব।

মানবশিশুর মেধা ও মননের শ্রীবৃদ্ধি

মানবশিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন সে মূলত মায়ের শরীরেরই একটি অঙ্গ হিসেবে গর্ভে অবস্থান করে। শরীরের অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি এ অঙ্গটি তথা গর্ভস্থ সন্তানও মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মায়ের মনের হাসি- আনন্দ, দুঃখ-বেদনা এবং তার লালিত বোধ-বিশ্বাস তার উপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। আর মায়ের মন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে চক্ষু ও কানের সাহায্যে মস্তিছে যেসব দৃশ্যাবলি ও তথ্য প্রেরিত হয়-তা দ্বারা।

কেননা মানুষ চোখের সাহায্যে যা দেখে ও কানের সাহায্যে যা শোনে তা প্রথমে করে বিবেকের কাছে প্রেরণ করে। বিবেক ওই বিষয়টির ভালো-মন্দ বিচার করে তা মনের কাছে পেশ করে। মন ভালো-মন্দ যেটা ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মন সম্পূর্ণ

স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কারো দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না। স্বাধীনচেতা মনের গৃহীত সে সিদ্ধান্তই শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মন কোনো বিষয় বাস্তবায়ন করতে বললে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে থাকে। আর মন কোনো বিষয়ে বাধা দিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা করা থেকে বিরত থাকে।

উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি স্বীয় চোখ ও কানকে ভালো কাজে নিয়োজিত রাখবে তার মন ভালো থাকবে আর যার মন ভালো থাকবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ভালো থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজ চোখ ও কানকে মন্দ কাজে ব্যয় করবে, তার মন মন্দ ও অসৎপ্রকৃতির হয়ে যাবে। আর যার মন মন্দ ও অসৎপ্রকৃতির হবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মন্দ প্রকৃতির হবে। সুতরাং যে গর্ভবতী নারী চোখ ও কানের হেফাজত করবে, তাকে ভালো কাজে ব্যবহার করবে, তার মন ভালো ও সৎ প্রকৃতির হবে। অন্যান্য অঙ্গের পাশাপাশি তার অন্যতম অঙ্গ-গর্ভস্থ সন্তানও ভালো ও সৎপ্রকৃতির হবে। আর যে গর্ভবতী নারী নিজের চোখ ও কান মন্দ ও অসৎকাজে ব্যয় করবে তার মন অসৎপ্রকৃতির হয়ে যাবে। তার অন্যতম অঙ্গ-গর্ভস্থ সন্তানও মন্দ ও অসৎপ্রকৃতির হয়ে যাবে।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সদস্য-শিশুসন্তানরা ভালো ও মন্দপ্রকৃতির হওয়াটা নারীজাতির উপরই নির্ভর করে। নারীরাই আগামীর পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। তারা ভালো ও মন্দ গুণাবলির নির্ধারক হয়ে থাকে। সুতরাং নারীজাতি যদি পৃথিবীকে সুন্দর, ভদ্র ও মার্জিত জাতি উপহার দিতে চায় তাহলে তা তাদের জন্য কঠিন কিছু নয়। নারীজাতির হাতে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ ও অধঃপতনের এ চাবিকাঠি দেখতে পেয়ে যুগে যুগে সকল জ্ঞানীগুণী ও দার্শনিকগণ নারীকে সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত পরিবেশে থাকার সুপরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তৈরি করেছেন তার জন্য ভিন্নতর নীতি। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। এ মহান ধর্ম ঘরের নির্মল পরিবেশ সবচেয়ে নিরাপদ পাওয়ায় নারীকে ঘরের উত্তম পরিবেশেই থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআনুল কারিম বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে বলেছে:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।প্রাচীন মূর্খতাযুগের অনুরুপ নিজেদের প্রদশর্ন করবে না। (সূরা আহযাব ৩৩)

গর্ভাবস্থায় নারীদের মানসিক অনুশীলন

গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় নারীজাতিই পারে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আলোকিত ও সুখময় করে তুলতে। এজন্য প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার। সন্তান গর্ভে থাকাকালীন যদি চিন্তাচেতনা ও আচার-ব্যবহারের দিক থেকে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি তারা কিছু বিষয়ে অনুশীলন করেন তাহলে এটা অত্যধিক ফলপ্রসূ হবে। এজন্য মা-বাবা উভয়কে কিছু দয়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের লক্ষ্যস্থির করতে

হবে আমরা আমাদের সন্তানকে কী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই? একজন গবেষক? সমাজসংস্কারক? না সমাজসেবক হিসেবে? লক্ষ্যস্থির করার পর গর্ভস্থ সন্তানকে নিয়ে বড় বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নের ডালপালা গজানোর লক্ষ্যে তাদেরকে ওই সংক্রান্ত মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত বিশেষত 'শামায়েলে তিরমিযি' অধ্যয়ন করা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বগুণের আধার। আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে যাবতীয় উত্তম ও উন্নত গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। জীবনগড়ার লক্ষ্যে তার স্বর্ণালি জীবনচরিত অধ্যয়ন গর্ভস্থ সন্তানের চরিত্র গঠনে অনন্য

ভূমিকা রাখতে পারে। এ ছাড়াও নিম্নযুক্ত আয়াতসমূহও ওজিফা হিসেবে গ্রহণ করা ফলপ্রসূ হবে।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানাও।”

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

عَلَيْنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত উম্মত সৃষ্টি কর। আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং আমাদের তাওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা ১২৮)

ভূমিষ্ঠ সন্তান পৃথিবীতে এক অচেনা মুসাফিরের মতো। কোনো মুসাফির যেমন অচেনা অপরিচিত কোনো দেশে হোলে অন্যের দিকনির্দেশনা ছাড়া চলায় দিল, যেমন অন্যরা তাকে ভুল-সঠিক যে পথই দেখিয়ে দেয় সে ওই পথেই চলতে থাােরে না গখভিন্ন অন্য কোনো পথে চলে না তেমনিভাবে মানবশিশুও এ পৃথিবীর এক নয়া মুসাফির। দুনিয়ার জীবনাচার ও প্রজীবনের পথ-ঘাট সম্পর্কে সে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখে না। এ সময় মাতাপিতাই তার প্রধান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে ধারণা রাখে যদি এ সময় তাকে সঠিক পথ দেখায় তাহলে সে ওই পথের উপর চলেই আপন জীবা পরিচালিত করে আর তারা যদি ভুল পথ দেখায় তাহলে উদ্ভ্রান্তের মতো ভুলপথে চলেই সে মূল্যবান জীবন বিনষ্ট করে দেয়।

শিশুমনে ঈমানের মজবুত ভিত স্থাপন

শৈশবকালীন এ শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এসময় যা শেখানো হয় শিশুমনে তা পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপির মতো শক্ত স্থান গেড়ে নেয়। আর এ শিক্ষাই গোটা জীবনের ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করে। জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ ফাউন্ডেশনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আর নারীরাই এ ফাউন্ডেশন গড়ার কাজে প্রধান প্রকৌশলীর ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ সকল মানবসন্তানই জন্মের পর দীর্ঘ আট থেকে দশ বছর মায়ের কাছেই কাটিয়ে থাকে। এ সময় মায়ের আচার-ব্যবহার ও পারিবারিক কৃষ্টি-কালচার তার চরিত্র-সংগঠক বিদ্যালয়ের কাজ করে থাকে।

মা ও পরিবার যদি ইসলামি ভাবধারায় পরিচালিত হয় তাহলে আজীবন সে ইসলামিধারাতেই আপন জীবন পরিচালনা করে। সাধারণত এ বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষা থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে না। আর পরিবার নামক এ বিদ্যালয় যদি সঠিক ইসলামি ভাবধারায় পরিচালিত নাও হয় কমপক্ষে সে যদি এ বিদ্যালয় থেকে তাওহিদ-রেসালাতের সুমহান শিক্ষাও লাভ করে থাকে তাহলে যুগের বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালায় তার

চাল-চলনে বিজাতীয় ফ্যাশন-স্টাইলের অনুপ্রবেশ ঘটলেও বিশ্বাসের জায়গাটা আপন অবস্থাতেই বহাল থাকবে। শৈশবকালীন শিক্ষা যেহেতু গোটা জীবনের ফাউন্ডেশনের ভূমিকা পালন করে থাকে তাই সন্তান-ভূমিষ্ঠ পরবর্তী সময়ে মাতাপিতাকে পূর্বের তুলনায় অধিক সচেতন ও মনোযোগী হতে হয়। ঘরের পাশাপাশি সন্তান যে পরিবেশে বেড়ে উঠবে তার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

তবে এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, প্রত্যেক সন্তানকেই এক সময় এ নষ্ট সমাজের গান্ধা পরিবেশে বিচরণ করতে হয়। এমন একটা সময় আসে যখন সন্তান আর মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চলাফেরা করে। তাদের চিন্তাভাবনা ও স্বভাবপ্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষত, যাদের সন্তানসন্ততি কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ে তারা অধিক পরিমাণে এর সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

সভ্যতার গতিসঞ্চার

সমাজে চলতে গিয়ে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারী পুরুষজাতিকে বিচিত্র স্বভাবের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়। তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। লেনদেন করতে হয়। কঠোর থেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এভাবে বিচিত্র স্বভাবের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে গিয়ে কখনো সে কষ্টানুভব করে, কখনো মর্মযাতনায় ভোগে, কখনো তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায়। এসব কারণে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণ করতে গিয়ে পুরুষজাতি প্রায়শই স্বাভাবিক কর্মচেতনা ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। তার কাজের গতি মন্থর হয়ে যায়। কখনো বা সে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হারিয়ে বসতে শুরু করে।

এমন সময় প্রয়োজন হয় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর, যে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে একে একে সব দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করবে। মমতা ও ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে হৃদয় ও মন প্রফুল্ল করে তুলবে। আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেবে দেহ-মনজুড়ে। ফিরিয়ে আনবে পূর্ববৎ কর্মপ্রেরণা, যার ভালোবাসার পরশে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারী শ্রেণি নব উদ্যমে, নতুন জীবন নিয়ে ফিরে যাবে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণের সুমহান দায়িত্ব পালনে।

সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারীকে মমতা ও ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে স্নাত করে নব চেতনা ও নতুন কর্মপ্রেরণা ফিরিয়ে দেওয়া সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুই হচ্ছে নারী (স্ত্রী)। নারীর দায়িত্ব হচ্ছে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারী স্বামীর হৃদয়-মন প্রফুল্ল রাখা। তার যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও টেনশন দূরীভূত করা। স্বামীর সঙ্গে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা। স্বামী যেন ঘরে এসে প্রশান্তি খুঁজে পায় সে রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। মানবসভ্যতা বিনির্মাণকারী নারীজাতির তৃতীয় এই দায়িত্ব কুরআন নিম্নযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও মমতা তৈরি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা রুম-২১)

অন্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তার স্ত্রী তৈরি করেছেন, যাতে তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারে । (সুরা আরাফ-১৮৯)

সততার সংরক্ষনঃ

ইতিপূর্বে মানবসভ্যতা বিনির্মাণে নারীজাতির গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা ছাড়ি হয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা মানবসভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের মহা অবদানের বিষয়টি জানতে পেরেছি। এখন আমরা তার চতুর্থ দায়িত্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করব। এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে চলা। এটি হল মানবসভ্যতার প্রতি নারীদের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ স্তরে নারীরা ঘরের কুসুমাস্তীর্ণ পরিবেশে নিজেদের বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

এ অধ্যায়ের শুরুতে নারীকে আমরা মালীর সাথে তুলনা করেছিলাম। সেখানে আমরা দায়িত্ব পালনের দিক থেকে নারী ও মালীর মধ্যে মিল ও সাযুজ্য দেখিয়েছিলাম। আমরা

বলেছিলাম, মালী যেমন বৃক্ষচারা রোপণ করে পরম যত্নের মাধ্যমে তাকে বড় করে তোলে। এরপর ইচ্ছা করলে দায়ের এক আঘাতেই দীর্ঘদিনের কষ্টের ফসল ধূলিসাৎ করে ফেলতে পারে। তাকে এক মূল্যহীন লাকড়িতে পরিণত করতে পারে। একইভাবে একজন নারীও ইচ্ছা করলে তিলেতিলে পরম কষ্টে গড়ে তোলা দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন-মানবসভ্যতাকে স্বীয় মোহনীয় রূপ-সৌন্দর্যের ফাঁদে ফেলে হত্যা করতে পারে। ধ্বংস করে দিতে পারে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে তার সফল ক্যারিয়ার
।
ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ঘরের চার দেয়াল ডিঙিয়ে নারী যখনই বাইরে পা রেখেছে গোটা সমাজ তখন ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার ইতিহাস এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নারীর অবাধ বিচরণই এই দুই ঐতিহাসিক সভ্যতাকে ধ্বংসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল। অধুনাকালে পশ্চিমা নারীরা এ চতুর্থ দায়িত্ব পালন না করার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতাও ধ্বংসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছে।

'সমস্যা কোথায়' শিরোনামে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, যার মাধ্যমে পাঠক সবিস্ময়ে অবগত হতে পারবেন যে, একসময় দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করা গ্রিক ও রোমান সভ্যতার শক্ত ভিত কীভাবে নারীর কোমল হাতের স্পর্শেই ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। সবশেষে আমাদের চোখের সামনেই পশ্চিমা সভ্যতাও নারীর হাতে কীভাবে ধ্বংস হতে চলেছে।

এ কারণে ইসলাম অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে মূর্খতাযুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان নারী হচ্ছে আবরণীয় সত্তা। সে যখন বের হয় তখন শয়তান তার প্রতি চোখ তুলে তাকায়।'

উপর্যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতার রক্ষকের সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। উচ্চকিত করেছে তার মান ও মর্যাদা। আর মর্যাদার এ আসন সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন ব্যতীত তাদের ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছে। তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পিতা, স্বামী, ছেলের কাঁধে অর্পণ করেছে। এমনকি নামাজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ক্ষেত্রেও নারীকে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে।

এক্ষেত্রে এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, নারীদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহীকরণের বিধান বোধহয় পর্দাহীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত; তাদের বেপর্দা হয়ে মসজিদে যাওয়াটা মনে হয় নিষেধ। আর পর্দা করে গেলে কোনো সমস্যা নেই। আসলে বিষয়টা এমন নয়। বরং নারীরা সম্পূর্ণ শরয়িপর্দা করে মসজিদে গমন করার ক্ষেত্রেই হাদিসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নারীজাতি কঠোর থেকে কঠোরভাবে পর্দা পালন করে গেলেও এ বিধানের আওতায়ই পড়বে। ইসলামের এ কথাৎ অবস্থানের কারণ অত্যন্ত মহান। ইসলাম নারীকে ঘরে রাখার মাধ্যমে মানবসভ্যতারে ধ্বংসের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে।

ইসলামের উল্লিখিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আঁচ করা যায় যে, শুং শরীর ও চেহারা ঢাকার নামই পর্দা নয়; বরং পর্দা হচ্ছে এক উন্নত সংস্কৃতির নাম। এক মহান আদর্শের নাম। যার মধ্যে গোটা মানবজাতিকে রক্ষার এক অনন্য দর্শন নিহিত রয়েছে। ইসলাম এর মাধ্যমে মানবসভ্যতা রক্ষার সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলামের এ সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা সমাজ তো বটেই; এমনকি আমাদের ইসলামি সমাজের কিছু গবেষকেরও দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তারা এক্ষেত্রে মারাত্মক হোঁচট খেয়েছেন। পর্দাকে তারা দেহ ও মুখ ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। মাকসাদ থেকে সরে গিয়ে তারা বৈধতার পথ সন্ধান করেছেন। পারিবারিক নারীকে তারা সামাজিক নারী বানাতে চেয়েছেন। যাই হোক, এটি ভিন্ন ময়দান। সময়-সুযোগ হলে ইনশাআল্লাহ আমরা অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত দালিলিক আলোচনা করব।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম মানবসভ্যতার সুরক্ষা ও তা সংরক্ষণের জন্য ইসলাম নারীর যাবতীয় প্রয়োজন পুরুষের কাঁধে অর্পণ করে ঘরের কুসুমাস্তীর্ণ পরিবেশে তার বিচরণ সীমাবদ্ধ করেছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাকে ঘর

থেকে বের হতে নিষেধ করেছে। আর যখন বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন আপাদমস্তক (চেহারাসহ) অনাকর্ষণীয় কাপড় দ্বারা নিজেকে আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সুরা আহযাব-৫৯)।

গ) শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই, হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা পর্দা-শালীনতা বজায় রেখে জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তার যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা, হজরত আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, মায়মুনাহ, উম্মে সালামাহ এবং সাফিয়া বিনতে হুয়ায় (রা.)-এর কাছে হাদিসের জ্ঞান লাভ করতেন। নবিপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। উম্মুল মোমিনিন হজরত আয়েশা (রা) একাই ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যা সব মুসলিম হাদিস বর্ণনাকরীর মধ্যে ২য় সর্বোচ্চ। এছাড়া ওই সময় অধিকাংশ নারী সাহাবি তাদের মেয়েদের যত ধরনের নারীঘটিত ব্যক্তিগত মাসআলা-মাসায়েল দরকার হতো, তা হজরত আয়েশা (রা.) থেকে শুনতেন, আমল করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন কেমব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। যার খণ্ডের সংখ্যা ৪৩টি। যেখানে নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন কর্ম-অবদান তুলে ধরা হয় ১০ হাজারেরও বেশি। উম্ম-উদ-দারদা সুগরাহ ছিলেন একজন তাবাইয়া। ৭ম শতাব্দীর দামেস্কের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ। তিনি তৎকালীন ইবনে সিরীন এবং হাসান আল-বাসারীর মতো বিশিষ্ট হাদিস বিশারদদের থেকেও উচ্চতর ছিলেন। এছাড়া তিনি খলিফা আবদ আল-মালিক ইবনে মারওয়ানের ফিকাহ শিক্ষক। আবার আবিদা আল-মাদানিয়াহ

ছিলেন একজন মুক্তকৃত দাস এবং স্প্যানিশ হাদিস পণ্ডিত হাবিব দুহানের স্ত্রী। ৮ম শতাব্দীতে যিনি ছিলেন বেশ পরিচিত। আবার ফাতিমা আল-বাতায়াহিয়াহ ৮ম শতাব্দীর একজন সুপরিচিত পণ্ডিত ছিলেন এবং যিনি দামেস্কে সহিহ বোখারি পড়াতেন। বিখ্যাত সাহাবির কন্যা আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবি ওয়াকাসও ছিলেন এতই জ্ঞানী যে ইমাম মালিক, হাকিম ইবনে উতায়বা এবং আইয়ুব সাখতিয়ানি ছিলেন তার ছাত্রদের মধ্যে। এছাড়া দশম ও দ্বাদশ শতকে জয়নাব বিনতে কামাল, ফখর আন-নিসা উম্মে মুহাম্মাদ শুহদাহ আল-বাগদাদিয়াহ (আবু নসর আহমদ ইবনে আল-ফারাজ আল-দিনাওয়ারির (মৃত্যু ৫৭৪ হি কন্যা) হাদিসে বাগ্মী এবং ক্যালিগ্রাফিতে পারদর্শী), উম্মুল কিরাম কারিমা বিনতে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম আল-মারওয়াযিয়াহ (মৃত্যু ৪৬৫ হি.)। হুমায়দাহ বিনতে মুহাম্মদ শরীফ ইবনে শামস আদ-দ্বীন আল-আসবাহানিয়্যাহ (মৃত্যু ১০৮৭), ত্রিয়দশ শতকের

দিকে ফাতিমা বিনতে আল-জুজদানিয়াহ (মৃত্যু ৫২৪), দামেস্কের জয়নাব বিনতে উমর আল-কিন্দি, উম্মে সালামাহ আস-সালাফিয়াহ, ইয়েমেনের আয়েশা বিনতে মুকবিল প্রমুখ। তারা হাদিস শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে, মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। তাছাড়া স্পেনের আয়েশা বিনতে আহমদ ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, লুবনি ছিলেন ভাষাবিদ এবং রাবিয়া কাসিসাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ বক্তা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণেও নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ ছিল। যেমন-আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় যা মরক্কোর ফেজে অবস্থিত। যেটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ইউনেস্কো এবং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুসারে এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম ও প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। যার প্রতিষ্ঠাতা ফাতিমা আল-ফিহরি বিশ্বনন্দিত একজন মুসলিম নারী, সিত্তুশ শাম ফাতেমা খাতুন যিনি তার সময়ে ২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটি মাদ্ররাসাতুশ শামিয়া আল বারানিয়্যা (১১৮৬ খ্রি.)। দ্বিতীয়টি হলো মাদ্ররাসাতুশ শামিয়া আল জাওয়ানিয়া। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা। মুসলিম জনহিতকর কাজের জন্য ছিলেন বিখ্যাত। জিহাতুস সলাহ আদির কারিমা ছিলেন ইয়েমেনের শাসক আলী দাউদের মা। যিনি জুবাইদ শহরের মাদ্রাসায়ে ইসলাহিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। তাতার হাজ্জাজিয়্যা (মালিক নাসির মুহাম্মদ বিন কালাউনের মেয়ে) যিনি ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসায়ে হাজ্জাজিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। খাওয়ান্দ বারাকাহ যিনি ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাসা উম্মুস সুলতান প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ও চিকিৎসক হিসাবেও নারীর ব্যাপক অবদান আছে। যেমন-সাহাবি উম্মে সুলাইমের। আইনশাস্ত্রে ছিল অধিক পাণ্ডিত্ববান নারী । যেমন-ওমর (রা.)-এর যুগে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। এমনকি রাজনীতি শিক্ষায়ও নারীর ভূমিকা ছিল। যেমন-আলী (রা.)-এর

যুগে আয়েশা (রা.)। যা নারীর রাজনীতি ও শিক্ষায় উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা এবং সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকানের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো মুসলিম নারীর সমাজসেবার অনন্য উদাহরণ।

ইসলামের শিক্ষাবিস্তারে নারীর অবদান কতটুকু তা চোখ বন্ধ করেই অনুধাবন করা যায়। আর এ নারীর অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইবনুল কাইয়িম (রা.) বলেন, সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীই যেন পুরো সমাজ।

ঘ) জ্ঞান অর্জনে নারী

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ‘আসমাউর রিজাল’ নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মহিলার

নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন। বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, ‘‘আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।’’ অপর একজন আয়েশা যিনি সা‘দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত

পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- ‘‘তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।’’

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরান্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা বহু

সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিয়া ছিলেন। হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিয়া ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, করীমা বিনতে আল্-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু

‘আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু পালনে,এমনকি হিসাব কিতাবে

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো। সাহাবী উরওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন, ‘‘আমি উম্মূল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেছেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাও অন্তর্ভুক্ত।ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা

খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে শরীফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, খাওলা বিনতে তাওরীত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।জীবনের বিভিন্ন সমস্যার

সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.

“প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাছে লোক আসতো।”[23]

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।

আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما.

''আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।''

ফিকাহ ও ফতোয়া :

ইবনে কাইয়ুম (রহ.)-এর ভাষ্য মতে, প্রায় ২২ জন নারী সাহাবি ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন। এর মধ্যে সাতজন উম্মাহাতুল মুমিনিন (নবীজির পূতঃপবিত্র স্ত্রী) ছিলেন। আর তাঁদের সবার মধ্যে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) 'ফকিহুল উম্মাহ' উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আলাউদ্দিন সমরকন্দি (রহ.) (৫৩৯ হি.)-এর মেয়ে ফাতিমা ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ফকিহ (ইসলামী আইনবিদ)। তিনি তাঁর বাবা ও স্বামীর কাছ থেকে ফতোয়া লেখা শিখেছিলেন। তাঁর স্বামী ইমাম আলাউদ্দিন আল কাসানি (রহ.) (৫৮৭ হি.) 'বাদায়েউস সানায়ে' সংকলন ও বিন্যস্ত করার সময় যখন তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিত, তখন তিনি তাঁকে সতর্ক ও সংশোধন করে দিতেন।

ইমাম তাকি উদ্দিন ইব্রাহিম (রহ.)-এর মেয়ে আমাতুর রহমান ফিকাহশাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁকে 'সিত্তুল ফুকাহা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

কবিতা ও সাহিত্য :

মুসলিম নারীরাও সাহিত্য ও কাব্যে বিশিষ্ট অবস্থান অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মহান কবি ও সাহিত্যিকও রয়েছেন। এর মধ্যে মরিয়ম বিনতে আবু ইয়াকুব (রহ.) ছিলেন আন্দালুসের একজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক। তিনি নারীদের কবিতা ও সাহিত্যও শেখাতেন।

অনুরূপভাবে বিখ্যাত মুহাদ্দিস জয়নাব বিনতে কামাল হাশমি (রহ.) ছিলেন মক্কার বুদ্ধিজীবী নারীদের একজন; সেই সঙ্গে কবিতার প্রতি অনুরাগীও ছিলেন।

এ ছাড়া আন্দালুসের কবিদের মধ্যে গাসসানিয়াহ, ওয়াদি আশিয়া, নাজহুন প্রমুখ নারী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্যালিগ্রাফার ও লেখিকা : ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের সময়কালে অসংখ্য মুসলিম নারীর কথা উল্লেখ রয়েছে, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও বিকাশে কোনো অংশেই কম ভূমিকা পালন করেননি। লেখালেখি ও ক্যালিগ্রাফিতেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এর মধ্যে ফখরুন নিসা শহিদা বিনতে আহমদ (রহ.) লেখিকা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি ভালো ও সুন্দর লিখতেন।

উম্মুল ফজল ফাতিমা বিনতে হাসান বিন আলী আল ইকরা (রহ.) ছিলেন বাগদাদের একজন বিখ্যাত ও সুপরিচিত লেখিকা। ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, ফাতিমার সুন্দর হস্তলিপি দেখে দেখে মানুষ লেখা শিখত আর তিনি বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ইবনুল বাওয়াবের লেখা হুবহু নকল করতেন।

অনুরূপভাবে আমাতুল আজিজ খাদিজা বিনতে ইউসুফ (রহ.) ছিলেন একজন আলেমা, পণ্ডিত ও মুহাদ্দিস। তিনি ক্যালিগ্রাফির জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, তিনি ক্যালিগ্রাফারের একটি দল থেকে ক্যালিগ্রাফি শিখেছেন।

ঙ) সামজিক কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদানঃ

সমাজ হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক জনপদের নাম। আর এ জনপদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাই হল সামাজিক কাজ। এ কাজ যখন বিশেষ কোনো প্লাটফর্মের অধীনে সম্পন্ন হয় তখন তাকে সামাজিক কর্মক্ষেত্র বলা হয়।

সমাজে যেহেতু ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, সাদা-কালো, ধনী-গরিব সব প্রকৃতির মানুষের বসবাস হয়ে থাকে তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাদের সকলের অংশগ্রহণ হয়ে থাকে। সকলের অংশগ্রহণের ফলে সামাজিক কর্মকাণ্ডে এক অঘোষিত তুমুল প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রত্যেকেই একে অপরের উপরে উঠতে চায়। একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। অপরের তুলনায় বেশি মুনাফা হাসিল করতে চায়। এভাবেই সামাজিক কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলতে থাকে।

আর প্রতিযোগিতার ধর্মই হচ্ছে নির্দয়তা, কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা। এখানে দয়ামায়া বলতে কোনো শব্দ নেই। কোনো প্রতিযোগীই অপর প্রতিযোগীর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

দেখায় না। বরং কঠোরতা ও নির্দয়তা প্রদর্শন করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আর পুঁজিবাদের 'কল্যাণে' এ নির্দয়তা শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু সামাজিক কাজে ভালো-মন্দ সব প্রকৃতির লোকই অংশগ্রহণ করে, এ কারণে প্রতিযোগিতায় জেতার লক্ষ্যে অসাধুতার পথ অবলম্বন করতেও অনেকে পিছপা হয় না।

সুতরাং সামাজিক কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের অর্থ হল এক চরম দ্বান্দ্বিকতাপূর্ণ প্রতিযোগিতার ময়দানে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া, যেখানে দয়া-মায়া বলতে কোনো শব্দ নেই; বরং নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতাই হল তার ধর্ম। এখন দেখার বিষয় হল, নারীজাতি এমন নির্দয়, নিষ্ঠুর ও শত্রুতাপূর্ণ প্রতিযোগিতার ময়দানে লড়াই করতে পারবে কি না? তাদের এ পরিমাণ যোগ্যতা রয়েছে কি না-যার মাধ্যমে তারা এ ময়দানে সফলতার সাক্ষাৎ পেতে পারে?

এতে তো সকলেই একমত যে, এমন নির্দয়, নিষ্ঠুর ও শত্রুতাপূর্ণ প্রতিযোগিতার ময়দানে সফলতা পেতে হলে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই অন্যান্য প্রতিযোগীর তুলনায় শক্তিশালী হতে হবে। অন্যথায় এ নিষ্ঠুর ময়দানে প্রতিপক্ষের নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা বৈ ভিন্ন কিছু কপালে জুটবে না। এত কিছুর পরেও নারীরা সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবদানের স্বাক্ষর রেখেই চলছে। দৈহিক, মানসিক সামর্থ্যের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা অনেক পেশায় সমাজ গঠনে বিভিন্ন পেশায়
যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই এ জড়িত আছে। এসব অনেক পেশায় অনেক সেবা প্রার্থী নারী হওয়ায় একটি উত্তম বিকল্প তৈরী হচ্ছে।

চ) যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাঃ

ইতিহাসে মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা এবং মানবসেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা শুধু আহতদের সেবা করেননি, বরং অনেক সময় সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং কৌশলগত সহায়তা প্রদান করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধ পর্যন্ত মুসলিম নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবোজ্জ্বল।

ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ এক বিশেষ গৌরবময় অধ্যায়। তাঁরা শুধু পিছন থেকে নয়, সামনের সারিতেও সাহসিকতা, ত্যাগ ও মানবসেবার

অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন। এই নারীরা কখনও যোদ্ধা, কখনও সেবক, আবার কখনও পরামর্শদাতা হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম নারীর ভূমিকা

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ:

নাসিবা বিনতে কা'ব (রা.)

তিনি ওহুদ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে মহানবী (সা.)-এর চারপাশে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তলোয়ার এবং ঢাল নিয়ে লড়াই করেন। তার এই সাহসিকতা ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয়।

সুমাইয়া বিনতে খায়াত (রা.)

ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন একজন নারী। তার আত্মত্যাগ ইসলামের জন্য লড়াইয়ের চেতনায় নারীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

২. যুদ্ধক্ষেত্রে সেবিকা এবং চিকিৎসক

অনেক মুসলিম নারী যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের সেবা করেছেন এবং তাদের চিকিৎসা দিয়েছেন।

রুফাইদা আল-আসলামিয়া (রা.)

তিনি ইসলামের প্রথম নার্স হিসেবে পরিচিত। বদর, ওহুদ, এবং খন্দক যুদ্ধে তিনি আহতদের চিকিৎসা করেন এবং একটি অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করেন।

অন্যান্য নারীরাও পানি সরবরাহ, অস্ত্র সরবরাহ এবং আহতদের স্থানান্তরে কাজ করেছেন।

৩. তথ্য সংগ্রহ এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম

মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং কৌশলগত সহায়তায় ভূমিকা রেখেছেন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.)-এর জন্য খাদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন।

তাদের কৌশলগত তৎপরতা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৪. মধ্যযুগে মুসলিম নারীদের অবদান

ইসলামের মধ্যযুগেও মুসলিম নারীরা বিভিন্ন যুদ্ধ এবং বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

আরওয়া বিনতে আহমদ

তিনি ছিলেন ইয়েমেনের এক শাসক, যিনি তার বুদ্ধিমত্তা এবং নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন।

শাজার-উদ-দুরর

তিনি মিশরের সুলতান ছিলেন এবং ক্রুসেড যুদ্ধের সময় মিশর রক্ষায় অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৫. আধুনিক যুগে ভূমিকা

মুসলিম নারীরা শুধু প্রাচীন যুগেই নয়, আধুনিক যুগেও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

অনেক মুসলিম নারী স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং উপনিবেশবিরোধী যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন।

যেমন, ভারত উপমহাদেশে অনেক নারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং কাশ্মীরের মতো স্থানে মুসলিম নারীরা এখনো নিজেদের ভূমি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

৬। যুদ্ধপরবর্তী পুনর্বাসন

মুসলিম নারীরা যুদ্ধের পর আহতদের শুশ্রূষা, খাদ্য বিতরণ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকায় পুনর্বাসনের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা যুদ্ধ-বিধ্বস্তদের সেবা দিয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

ছ) ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবাগণের অবদানঃ

মুসলিম মেয়ে -আহ্বানকারী এবং আহ্বানকৃত: নিশ্চয়ই কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। সাধারণত পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র এই কারণে যে এটাই ভাষার রীতি। তা সত্ত্বেও, কিছু কিছু নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষদের দেয়া হয়েছে। একই সাথে, আল্লাহ কিছু নির্দেশ শুধু নারীদের দিয়েছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে পুরুষদের থেকে তাদের আলাদা চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এই কারণে দাওয়াহ, শিক্ষা, সংস্কার ও নির্দেশনায় বিশেষভাবে মেয়েদের উপযোগী করে আহ্বান করাজরুরী। তাদের উপেক্ষা করা যাবে না। এটা এই কারণে যে রাসূল(সাঃ) পুরুষদের সম্বোধনকরার পর বিশেষভাবে মেয়েদের সম্বোধন করেছিলেন এবং শুধুমাত্র মেয়েদের শেখানোর জন্য তিনি সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন।

কুরআন আমাদের বলে যে পুরুষ তার ঘর ও পরিবারের ব্যপারে দায়িত্বশীল। "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর ঐ অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ," [৬৬:৬] এবং রাসূল(সাঃ)বলেছেন, "পুরুষ হচ্ছে তার পরিবারের অভিভাবক ও সে এর জন্য দায়িত্বশীল।" (বুখারি ও মুসলিম) এসব দলিল মেয়েদের শিক্ষা ও যত্নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে। অপর দিকে, কুরআন ও সুন্নাহতে এমন অনেক দলিল আছে যা সাক্ষ্য দেয় যে মেয়েদের জন্যও দাওয়াতী কাজ করা বাধ্যতামূলকঃ

(১) কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যা মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য দ্বীনের দাওয়াত দেয়া, ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে বাধ্যতামূলক করেছে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত – যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে এবং তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।" [৩:১০৪]

(২) দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার আহ্বান জানিয়ে মেয়েদের সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে কারণ আল্লাহ বলেছেন, "হে নবী পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পরপুরুষেরসাথে) মিষ্টি কণ্ঠে এমনভাবে কথা বল না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে এবং তোমরা উপযোগী কথা বলবে।" [৩৩:৩২] ইবন আব্বাস(রাঃ) 'উপযোগী কথা বলবে' – রাসূল(সাঃ)-এর স্ত্রীদের

প্রতি আল্লাহর এই আদেশ দ্বারা বুঝেছিলেন যে তাদের ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে। এটা সকল মুসলিম মেয়ের প্রতি আল্লাহর আদেশ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। আল্লাহ আরও বলেন, "মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর নামাজ কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে।" [৯:৭১] এই আয়াতে এটা স্পষ্ট যে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও সাধ্যানুযায়ী এই কাজের ভার দেয়া হয়েছে। রাসূল(সাঃ) বলেছেন, "মেয়েরা তাদের স্বামীর ঘর ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।" আর রক্ষণাবেক্ষণকারী হচ্ছে এমন কেউ যাকে কোন আমানত দেয়া হয়েছে ও সে তা যত্ন করে রাখবে।

ইসলামিক দাওয়াতের ক্ষেত্রে খাদিজা(রাঃ) এর ভূমিকাঃ

রাসূল সাঃ এর জীবনীতে দেখা যায় যখন প্রথম ওহী নাযিল হলো বিত স্বতন্ত্র অবস্থায় খাদিজা রাঃ এর গৃহী আসলেন। তারপর তাকে বললেন আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন তার ভয় চলে গেলে তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন কসম আমি নিজের নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বক্তব্য ছিল আল্লাহ শপথ তিনি কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না নিজ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে করেন ও দুঃখীদের খেদমত করেন বঞ্চিত ও অভাবিতগণকে উপার্জন ক্ষমা করেন মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথের বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।

বুখারী শরীফে বর্ণিত এ হাদীসের আলোকে দেখা যাচ্ছে এখানে খাদিজার রাঃ রাসূল সাঃ কে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পাশে যে নারী সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন তিনি খাদিজা রাঃ। প্রথম ওহী অবতরণের এই উত্তেজনা পণ্য ও অস্থির মুহূর্তে আল্লাহতালা আনহু এর নৈতিক সমর্থন সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে সাহস সান্তনা ও শান্তি প্রদান করেছিল।

আল্লাহর পথে সংগ্রাম শুধু জীবন দিয়ে হয় না এখানে জীবনের সাথে মাল ও অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বলেছেন

তোমরা নেকি অর্জন করতে পারো না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ থাকবেন না। (আল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৯২)

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পর তার সকল ধন সম্পদ তাবলীগে দিনের লক্ষে ওয়াকফ করেন।

আল্লাহ তাকে যে প্রচুর ঐশ্বর্যদান করেছিলেন দিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। নিজেকে সম্পদের অধিকারী মনে করলে বিরাট থেকে দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় রেখে যেতে পারতেন কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নতুন মস্তকে মেনে নিলেন সম্পদ ব্যয় করার আসমানী নীতি। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নির্দেশ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তাই আদর্শের প্রতি শুধু বিশ্বাস নয় মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ উচ্চারণই নয় উপস্থাপিত আদর্শের রূপায়নের জন্য কোন হাতে নিজের অঢেল সম্পদ ব্যয় করে আরবের ধনী শ্রেষ্ঠা এই মহিলাটি সব যুগের আদর্শবাদীদের জন্য এক উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন রাসূল ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদত এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সব আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদিজার দুঃশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেন। ১৪০ যখনই কোনো অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হতো, কেউ রাসূলুল্লাহ -এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মর্মাহত হতেন। কিন্তু খাদিজা (রা)-এর কাছে গেলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তার মনঃকষ্ট দূর হয়ে যেত। খাদিজা (রা) তার দুঃখকে হালকা করে দিতেন। তার দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকৃতি দিতেন এবং মানুষের আচরণকে যাতে তিনি হালকাভাবে গ্রহণ করেন, সেজন্য অনুপ্রাণিত করতেন।

নবুয়্যতের ৭ম বছরে মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তারা শিয়াবে আবু তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ-এর সাথে খাদিজা (রা)-ও সেখানে অন্তরিন হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদিজা (রা)-ও হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করেন।

সামাজিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান

ইসলামকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে, ইসলামী বিধান অনুসারে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি নিশ্চিত করতে হলে দাঈকে সামাজিকভাবে প্রভাবশালী হতে হবে। বস্তুত সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি ছাড়া সমাজ বদলের কাজ করা যায় না। সমাজে কোনো বিধান প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠিত কোনো নীতি বাতিলের জন্য প্রবল সামাজিক প্রভাব প্রয়োজন। জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য এ প্রভাব আরো প্রবল হওয়া আবশ্যক। 'শিয়াবে আবু তালিবে' বন্দি থাকা অবস্থায় খাদিজা (রা) মাঝে মাঝে

নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তার তিন ভাতিজা হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বুখতারী ও ঘুময়া ইবনুল আসওয়াদ- তারা সবাই ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর হওয়া সঙ্কেশেষ ভূমিকা পালন করেন। একদিন হাকীম ইবন হিযাম তার চাকরের মাধ্যমে ফুফু খাদিজার কাছে কিছু পাঠাচ্ছিলেন। পথে আবু জাহেল সেখানে উপস্থিত হন। তিনি জাহেলকে বললেন, 'এক ব্যক্তি তার ফুফুকে সামান্য খাদ্য পাঠাচ্ছে, ইমি তাতে বাধা দিচ্ছ?'

আরেকদিন আব্বাস (রা) কিছু খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিয়াব থেকে বের ছানো আবু জাহেল তার ওপর হামলা করার ফন্দি আঁটে। কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। এ কথা খাদিজা জানতে পেরে চাচা যুমআ ইবন আল- আসাদকে লোক মারফত বলে পাঠান, 'আবু জাহেল খাদ্য ক্রয়ে বাধা দিচ্ছে। তাকে কিছু কথা শুনিয়ে দিন।' যুমআ খাদিজা (রা)-এর কথামতো কাজ করেন। এরপর সে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়।

তাছাড়া খাদিজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তার পিতৃকূলের লোকদের ওপরও পড়ে। ইসলাম আবির্ভাবের সময় পিতৃকূল বনু আসাদ ইবন আবদিল উযযার পনেরো জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য পাঁচজন বদর যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়।

অনুপম চরিত্র

দাঈ ইলাল্লাহর চারিত্রিক গুণাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুপম নৈতিক চরিত্র। সবার জীবনে উন্নত চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও দাঈদের জন্য এর গুরুত্ব শতগুণ বেশি। লোকেরা দাওয়াত শুধু শুনতে চায় না, দাঈর জীবনে তাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। খাদিজা (রা) যৌবনে পদার্পণ করার পর তার উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র ও সংযমী জীবনের পরিচয় পেয়ে লোকেরা তাকে তাহিরা (পবিত্রা) উপাধি প্রদান করেন। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। নবী করীম সা ﷺ একদিন তাকে বললেন, আমি কখনো লাত-উজ্জার ইবাদত
বীরত্ব ও সাহসিকতা

দাওয়াতের পথ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। যখন কোনো ব্যক্তি তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে তখন তাকে সমগ্র পৃথিবীর চলমান স্রোতের বিপরীতে অবস্থান নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাদ-এর কাছে প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর খাদিজা (রা) তাকে ওরাকার কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহর সব ঘটনা শোনার পর ওরাকা বললেন, 'এ সেই রহস্যময় জিবরাঈল, যাকে মূসা (আ)-এর কাছে আল্লাহ নাযিল করেন। আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ ওরাকাকে বললেন, 'তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে?' ওরাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে তদ্রূপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।

খাদিজা (রা) ওরাকার কাছ থেকে শুরুতেই জানতে পেরেছিলেন সামনে অপেক্ষমাণ বিপদের ভয়াবহতা। কিন্তু তারপরও তিনি রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে দেননি, পরিত্যাগ করেননি। সব শক্তি ও সাহস নিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাকে এবং তার পথকে।

নির্লোভী ও ত্যাগী

একজন দাঈ হবেন নির্লোভী ও ত্যাগী। পৃথিবীর কোনো মর্যাদা বা পার্থিব কোনো সম্পদের আকর্ষণের কোনো মূল্যই নেই তার কাছে। কুরাইশদের মধ্যে খাদিজা (রা) ছিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজাত বংশীয়া, সর্বোচ্চ মর্যাদা- সম্পন্না সম্ভ্রান্ত এবং অতিশয় ধনাঢ্য মহিলা। এ কারণে সম্ভব হলে তার গোত্রের সবাই তাকে বিয়ে করার অভিলাষ পোষণ করত। খাদিজা (রা)-এর সাথে রাসূল -এর বিয়ের পূর্বে আরবের অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী,

সম্ভ্রান্ত সমাজপতিরা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দেন। কেননা, তার কাছে এগুলোর কোনো মূল্যই ছিল না।

ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেতের আয়েশা(রাঃ) এর ভূমিকাঃ

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন নবীর স্ত্রীদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমতী মহিলা। তার শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তির
সাহচর্যে কাটে, যার আগমন ঘটেছিল এই পৃথিবীতে দাঈ ইলাল্লাহ রূপে। বর্ণিত হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

منيرا

'হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'১৮৮

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহর সাহচর্য আয়েশা (রা)-কে তৈরি করেছে সমগ্র মানবজাতির কাছে আদর্শ হিসেবে। তার জ্ঞানের পরিধি ও ব্যাপকতা ছিল সুবিস্তৃত। শুধু উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যেই নয় বরং তৎকালীন সমগ্র নারী জাতির ওপর এবং খ্যাতনামা কিছু সংখ্যক সাহাবা ছাড়া সব সাহাবার ওপরই তার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-মর্যাদা ছিল অনস্বীকার্য। বিশিষ্ট সাহাবা আবু মূসা আল আশআরী (রা) বলেছেন যে, 'আমরা মুহাম্মদ -এর সাহাবাগণ কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে আয়েশা (রা)-এর নিকট সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সঠিক সমাধান পেয়ে যেতাম।' ১৮৯

আয়েশা (রা)-এর জীবনী থেকে ইসলামী দাওয়াতের নিম্নোক্ত পন্থা ও পদ্ধতি পাওয়া যায়।

কুরআন ও তাফসীরের জ্ঞানের মাধ্যমে দাওয়াত

দাঈদের প্রথম পুঁজি কুরআনের জ্ঞান। যে বিষয়ের দিকে মানুষকে দাওয়াত প্রদান করা হবে, সে বিষয়ে স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। যেহেতু দাওয়াতের মূল

বিষয় কুরআনের দিকে হবে। তাই প্রত্যেক দাঈর জন্য ইলমুল কুরআন অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে আয়েশা (রা)-এর অবদান ছিল অসামান্য। দীর্ঘ ১০ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র সাহচর্যে থেকে তিনি কুরআন অবতরণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। তার ঘরেই অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল হত। ইউনুস নামে তার এক দাস কে দিয়ে তিনি কোরাআন লিখিয়েছিলেন।

অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ::

কখনওবা নবী (স) এর নিকট অন্য ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমেও আয়েশা (রা) হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো- আয়েশা (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক লোক নবী(স)এর নিকট গণক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাদের কথার কোনো ভিত্তি নেই। লোকেরা বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! মাঝে মধ্যে তাদের কথা সত্যে পরিণত হয়। নবী (স)বললেন, সেটা জ্বিনদের থেকে জানা কথা।(সহীহ মুসলিম ৫৯৫৩)

আয়েশা (রা) অধিকাংশ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি কোনো কিছু শুনে বুঝতে না পারলে তা বারবার আলোচনা করতেন, যতক্ষণ না তিনি তা বুঝতে পারতেন।

ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ :::

একদা রাসূলুল্লাহ বললেন, 'বিচার দিবসে যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব ভোগ করবে।' আয়েশা (রা)-এর নিকট এ বিষয়টি খটকা লাগলে তিনি বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, অচিরেই তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে।' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এটি হলো আমলের উপস্থাপন। কিন্তু যার কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করা হবে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। (সহীহ বুখারী ১০৩)

আয়েশা (রা) বলেন, নবী-এর নিকট ইহুদিদের কিছু লোক এসে বলল, 'হে আবুল কাসিম, তোমার মৃত্যু হোক।' নবী বললেন, (وَعَلَيْكُمْ)

তোমাদের ওপরও।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আমি বললাম বরং তোমাদের মৃত্যু হোক ও ধ্বংস হোক।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে আয়েশা তুমি বাড়াবাড়ি করো না।
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন আপনি কি শোনেননি তারা কি বলছে? রাসুল সাঃ বললেন আমি কি তাদের তাই ফেরত দেইনি এবং বলিনি যে ওয়ালাইকুম অর্থাৎ তোমাদেরও মৃত্যু হোক???
(সহীহ আল মুসলিম ২১৬৫)

চিঠির মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ:::

রাসূলুল্লাহ সাৎ-এর জীবনীতে দেখা যায়, ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ কিংবা সপ্তম হিজরীর শুরুতে তিনি বড় বড় রাজা বাদশার নামে আমন্ত্রণ পত্র লেখেন। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় আয়েশা (রা)-কেও বিভিন্ন শহর বা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হয়েছে। লেখনী বিদ্যার সাথে তার তেমন পরিচয় না থাকলেও অন্যের মাধ্যমে তিনি লিখিয়ে নিতেন। কিন্তু পত্রের ভাব ও ভাষাবলি ছিল একান্তই তার নিজস্ব।

আরবি সাহিত্যের প্রধান সাহিত্যিকগণ আয়েশা (রা)-এর এসব পত্রাবলির সাহিত্যমূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলিতে স্থান দিতে আগ্রহী হয়েছেন। ইবনে আবদি রাব্বিহি রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ইকদুল ফরীদ-এর ৪র্থ খণ্ডে আয়েশা (রা)-এর অনেকগুলো পত্র সংকলিত হয়েছে (ঘ) কবিতার মাধ্যমে দাওয়াত

ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগে কবিদের অনেক কবিতা আয়েশা (রা)-এর মুখস্থ ছিল। তিনি কবিতার অংশবিশেষ বিভিন্ন সময়ে উদ্ধৃতি আকারে পেশ করতেন। নবী করীম (সা) আয়েশা (রা)-কে কবি যুহায়ের ইবনে জানাবের নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় আবৃত্তি করতে বলতেন-
يوما منذركة الْعَوَاقِبُ قد نما ارفع ضعيفك لا يتمالك ضعفة الى عليك بما فعلت فقد ... وإن من يلبي عليك أو تحريك جزاكم .... 'তুমি ওঠাও তোমার দুর্বলকে। যার দুর্বলতা কোনোদিন তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। অতঃপর সে যা অর্জন করেছে তার ফলাফল সে ভোগ করবে। সে তোমাকে প্রতিদান দেবে অথবা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার কর্মের যে প্রশংসা করে, সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে প্রতিদান দিয়েছে।

এ কবিতা শুনে নবী (সা) মন্তব্য করলেন, 'হে আয়েশা, সে সত্য বলেছে।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

আয়েশা (রা) তার মরহুম ভ্রাতা আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করেন-

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا وَكُنَّا كَنَدْمَانِي جَذِيمَةَ حِقْبَةً فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا ... ... لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَانَ 'আমরা দুজন জামিমার দু'সাথীর ন্যায় একটা দীর্ঘ সময় একসাথে বসবাস করেছি। এমনকি লোকেরা আলোচনা করত যে, আমাদের এ জুটি কখনো পৃথক হবে না। অতঃপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, তখন আমি ও মালিক যেন দীর্ঘকাল সহঅবস্থান সত্ত্বেও একটি রজনীও একসাথে থাকিনি। (সুনানে আত তিরমিজি ১০৫৫)

হাসসান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সভাকবি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'হাসসান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, জিবরাঈল (আ)-এর সাহায্য তুমি লাভ করবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ -কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, হাসসান তাদের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট থেকে মুক্ত করেছে।' সুস্পষ্ট সাবলীল প্রাঞ্জল ও মার্জিত বক্তব্যের মাধ্যমে::

এটা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ দিক। দাঈ তার বক্তব্য আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করতে সাবলীল, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলবেন। আল্লাহ তাআলা মুসা (আ)-কে যখন ফেরাউনের কাছে দাওয়াত পেশ করতে বলেন, তখন মূসা (আ) তার ভ্রাতা হারুন (আ)-কে চেয়ে বলেছিলেন,আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশি বাকপটু, তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয়।'

আয়েশা (রা) অত্যন্ত সুমিষ্ট, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। তার ছাত্র মূসা ইবনে তালহা তার সম্পর্কে বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ 'আমি আয়েশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর অলঙ্কারময় ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে

দেখিনি। (সুনানে আত তিরমিযী ৩৮৮৪)

তার বর্ণনায় রয়েছে শৈল্পিক রূপ ও সৌন্দর্য। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ -এর ওপর অহী অবতীর্ণের বর্ণনা উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রা) বলেন-

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ

'প্রথম রাসূলুল্লাহ-এর ওপর অহী নাযিল হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের স্বচ্ছ ঊষার ন্যায় তার কাছে দীপ্তমান হতো।(সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৩) রাসূলুল্লাহ-এর সত্য স্বপ্নকে তিনি সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ ভঙ্গিমায় 'প্রত্যুষের কিরণের' সাথে তুলনা করেছেন। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাওদা (রা)-এর অবদান

প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা

সাওদা (রা) ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ভাগ্যবতী নর-নারীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মুষ্টিমেয় সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা রাসূল -এর আনীত রিসালাতের আহ্বানে সাড়া প্রদান করে বরণ করে নিয়েছিলেন অকথ্য জুলুম-নির্যাতন। কিন্তু এসব জুলুম-পীড়ন একজন মুসলমানকেও ইসলাম ত্যাগে সম্মত করতে পারেনি।

ইসলামের জন্য ২ বার হিজরত

রাসূলুল্লাহ-এর নবুয়্যতের ৫ম বছরে কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে, তা মুসলমানদের সহ্য শক্তির বাইরে চলে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সিদ্ধান্ত নেনে, কিছু মুসলমানকে হিজরত করে আবিসিনিয়া যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ-এর এ সিদ্ধান্ত

মোতাবেক কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মক্কার অসহায় মুসলিমদের প্রথম দলটি যখন হাবশায় হিজরত করেন, তখনও সাওদা (রা) মক্কার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু তাদের অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা অতিক্রম করতে লাগল, তখন মক্কার মুসলিমদের দ্বিতীয় আরেকটি দল হাবশায় হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সাওদা (রা) ও তার প্রথম স্বামী সাকরান এই দলটির সাথে হাবশায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ নবুয়্যুতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় পৌছে একটু স্থির হওয়ার পর যায়িদ ইবন হারিসাকে আবার মক্কায় পাঠান সাওদাসহ অন্যদের নেওয়ার জন্য। যায়িদ মদীনায় ফিরে আসেন, ফাতিমা, উম্ম কুলসুম, সাওনা, উম্মু আয়মান ও উসামাকে নিয়ে। এভাবে ইসলামের জন্য ২ বার মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হন সাওদা (রা)।

রাসূলুল্লাহ স-এর দাওয়াতি জীবনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান নবুয়াতের দশম বছরের রমযান মাস থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাদ্র-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন তিনি। কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহ সাড়-এর সাথে সাওদা ও আয়েশা (রা)-এর বিয়ে হয়। বিয়ের পর আয়েশা (রা) প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। এ সময় সাওদাই ছিলেন মূলত একক গৃহিণী। তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে রাসূলুল্লাহ সাদ্র-এর ঘর গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। মাতৃহারা কন্যা ফাতিমাসহ অন্যদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সম্ভবত তখন পর্যন্ত নবী পরিবারের সদস্য আলীরও তত্ত্বাবধান করেন। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ -এর জীবনের এক কঠিন ও সঙ্কটময় পর্বে সাওদা (রা) জীবন সঙ্গিনী হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে খাদিজা (রা)-এর শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেন।

অকৃপণ হস্তে আল্লাহর পথে দান

রাসূলে কারীম স-এর স্বভাব-চরিত্রের এক অনুপম দিক ছিল দানশীলতা। সাহাবাগণের মধ্যে যিনি যতবেশি তার নিকটে থাকার সুযোগ পেয়েছেন, তার মধ্যেই এই বিশেষ গুণটির ছাপ পড়েছে অধিক। রাসূলুল্লাহ-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য তার সহধর্মিণীগণই সর্বাধিক মাত্রায় গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ -এর বিশেষ গুণটি তাদের সবার মধ্যে সাধারণভাবে পাওয়া গেলেও একমাত্র আয়েশা (রা) ছাড়া সাওদা (রা)-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ইবনে সিরীন বর্ণনা করেছেন, একবার খলীফা

উমর (রা) সাওদা (রা)-এর নিকট একটি থলি পাঠান। তিনি বহনকারীকে প্রশ্ন করেন, 'থলিতে কী?' বহনকারী বলল, 'দিরহাম।' 'থলিতে খেজুরের মতো দিরহাম পাঠানো হয়'- এ কথা বলে তিনি তখনই দিরহামগুলো মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হাফসা (রা) তার অবদান

হাফসা (রা) ছিলেন একদিকে উমর (রা)-এর কন্যা, অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ক্ষুদ্র-এর স্ত্রী। এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের সাহচর্য তাকে তৈরি করেছিল ইসলামের মহান সেবকরূপে। নিচে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার কিছু অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

শিক্ষার মাধ্যমে

তৎকালীন আরবে নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন অনেক পশ্চাৎপদ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন তখন নারী ও পুরুষ কারো ক্ষেত্রেই তেমন ছিল না। হাফসা (রা)-এর পক্ষেও অন্যান্যদের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ হয়নি। কিন্তু মহান শিক্ষক রাসূল এবং পিতা উমর (রা)-এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে থেকে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জনের অপূর্ব সুযোগ পান। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী। শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তার আগ্রহও ছিল প্রবল। দ্বীনি বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান ছিল, যা বিভিন্ন ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী কোনো সাহাবা জাহান্নামে যাবে না।' হাফসা (রা) এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন-
(وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

'তোমাদের সবাইকে জাহান্নামে হাজির করা হবে।' ২৯৭

নবী করীম বলেন, হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে একথাও তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

(ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

'অতঃপর আমি ভীরু লোকদের নাজাত দেবো এবং যালিমদের হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামে ছেড়ে দেব।'
রাসুল এন্ড হাফসা (রা)-এর বাক্যালাপে মুগ্ধ হয়ে এবং তার মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ করে সব সময় তাকে বিভিন্ন জিনিস শেখানো এবং জ্ঞানীরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা)- এর নিকট থেকে লেখা শেখেন।

এই শিফা (রা) 'নামলা' ২৯৯ নামক এক প্রকার ক্ষতরোগ নিরাময়ের ঝাড়ফুঁক জানতেন। জাহেলি যুগে তিনি এই ঝাড়ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি জাহেলি যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে সেই মন্ত্র আপনাকে শুনাবো। রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এ ঝাড়ফুঁকটি তুমি হাফসা (রা)-কে শিখিয়ে দাও।'

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ, শিফাকে বলেন, তুমি কি হাফসাকে এ নামলার মন্ত্রটি শিখিয়ে দেবে না, যেমন তাকে লেখা শিক্ষা দিয়েছ?'৩০০ এসব বর্ণনা থেকে হাফসা (রা)-এর জ্ঞান চর্চার আগ্রহ উদ্দীপনা এবং এ বিষয়ে নবী-এর ভূমিকা জানা যায়।

হাদীস বর্ণনা

নবীপত্নী হিসেবে রাসূলুল্লাহ-কে কাছ থেকে দেখার, তার থেকে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। তার থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং স্বীয় পিতা উমর (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে চারটি হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং ছয়টি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ) এককভাবে বর্ণনা করেছেন।
ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী

হাফসা (রা) ছিলেন ইসলামের একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি তার জীবনে ইসলাম চর্চা করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে ইসলামকে অনুসরণ করতে হয়। ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত ইবাদত গুজার ছিলেন। সব সময় রোযা রাখতেন এবং রাত জেগে জেগে নামায পড়তেন

জিবরাঈল (আ) তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স্ব-কে বলেছেন, তিউ অতিমাত্রায় সিয়াম পালনকারিণী এবং রাতে বেশি ইবাদতকারিণী। বোখ অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

হিজরতকারিণী

হাফসা (রা) তার প্রথম স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের পথে শাহাদাত বরণকারী যোদ্ধার স্ত্রী। ৩০১

দানশীলতা

এ বিদুষী মহিলা অর্থের প্রতি খুব নির্লিপ্ত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার বিষয়সম্পত্তি গরিব-মিসকিনদের কল্যাণের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে ভাই আব্দুর রহমান বিন উমর (রা) তাকে সাহায্য করেছিলেন। তার পিতা তাকে গাবাতে যে ভূসম্পত্তি দিয়ে যান, তিনি আল্লাহর রাস্তায় যা ওয়াকফ করে দেন।

কুরআনের সংরক্ষক

খলীফা আবু বকর (রা) কুরআনের যে কপি তৈরি করান, তার মৃত্যুর পর তা উসমান (রা)-এর কাছে ছিল। তারপর তা হাফসা (রা)-এর কাছে রাখা হয়। তার মৃত্যু পর্যন্ত কপিটি তার কাছেই রক্ষিত ছিল।

জ) পুরুষদের সংশোধনে নারীদের ভূমিকা

স্ত্রীর উপর স্বামীর এ এক সাধারণ অধিকার যে তিনি ঘরে স্বামীর সুখ ও সান্ত্বনার প্রতীক হবেন। ঘরের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখবেন। ক্লান্ত স্বামীর প্রশান্তির কারণ হবেন। আর যাদের স্বামী দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন, তাদের কাজ দ্বিগুণ। তাদেরকে কষ্টও সহ্য করতে হয় দ্বিগুণ। তাদেরকে একদিকে যেমন ঘরের সুখ শান্তি ও প্রশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তেমনি স্বামীর দীনি আন্দোলনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। স্বামীকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে হয়। স্বামীর চতুর্মুখী চিন্তাকে প্রশান্তিতে পরিণত

করতে হয়। স্বামীর ক্লান্তিকে মধুর পরশে বিদূরিত করতে হয়। কারণ একদিকে তার স্বামীর উপর উপার্জনের দায় দায়িত্ব ন্যস্ত। অপরদিকে তাগুত সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে খোদার দীন প্রতিষ্ঠার তিনি একজন সৈনিক। গোটা বাতিল সমাজের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধরত। তার মাথায় হাজারো সমস্যা গিজ গিজ করে। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি বিচলিত থাকেন। সুতরাং এরূপ স্বামীর জন্যে স্ত্রীর দায়িত্ব দ্বিগুণই হয়েই থাকে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর শারিরিক ও মানসিক যোগ্যতাকে অটুট রাখার দায়িত্ব স্ত্রীকেই গ্রহণ করতে হয়। ঘরকে মধুময় পরিবেশে পরিণত করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। তার এ কাজ প্রত্যক্ষ জিহাদে শরীক হবারই সমতুল্য। এ কাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

কর্মক্ষেত্রে তথা সামজিক কাজে নারীদের ক্ষেত্রে ইসলামের সতকর্তা এবং পালনীয় বিধানঃ

প্রথমে এটা স্বীকার করতেই হবে যে নারীর আসল কর্মক্ষেত্র তার গৃহ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের Reference অন্তত তাই বলে। কিন্তু সাহাবাগণের যুগ থেকেই গৃহাভ্যন্তর থেকে নারীরা বাইরে যে কাজ করেছেন তার Practice যে ছিলো তাও প্রমাণিত সত্য। গৃহভ্যন্তরে নারীদের থাকার বিষয়টা শুধু নবী পত্নীদের বেলায় প্রযোজ্য এটা কুরআনের আয়াতেই সুস্পষ্ট যা অন্য নারীদের বেলায় কঠোরভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

কোন কোন স্কলার এই আয়াতের নির্দেশ সকল যুগের সকল নারীর জন্য সমানভাবে পরিপালনযোগ্য বলে ধরে নিয়েছেন যদিও আল্লাহ নিজেই তাদের বলছেন যে তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও। নবী পত্নীদের সাথে অন্য মুসলিম নারীদের পার্থক্য তারা ভুলেই গিয়েছেন। অন্য নারীরা বিধবা হলে ইদ্দত পালন শেষে তাদের বিয়ে হতে বাধা নেই কিন্তু নবী পত্নীদের বেলায় এ সুযোগ নেই। এ রকম আরো বিষয় রয়েছে যেখানে নবী পত্নীগণের মর্যাদা সাধারণ নারীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী সে কারণে তাদের চলাফেরা ও বাইরের জগতে প্রবেশে নিষেধ করা হয়েছিল।

তবুও কি মেয়েরা এমনকি রাসুলের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ নেননি? মেয়েরা সৈনিকদের খাবার রান্না করেছেন, জখম হওয়া সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষাও করেছেন-এমন প্রমাণ হাদীসে বহু রয়েছে। আধুনিককালে মেয়েরা আরো এগিয়েছে— লেখাপড়া শিখে এখন তারা শিক্ষক হচ্ছেন । পেশাদার ব্যাংকার, বিচারক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী হচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ শীর্ষ ধাপেও এগিয়ে এসেছেন। আধুনিক স্কলারগণ তার জন্য মনোনীত কোন পেশা নির্বাচনে বিশেষতঃ শিক্ষকতা, নার্সিং ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এবং কাউন্সিলিং জাতীয় কাজে তাদের বাঁধা মনে করেন না । তবে যেসব পেশায় শরীর, বিচার ক্ষমতা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে নারী ভুল করতে পারেন সে ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন যেমন প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি, আকাশযানের চালক, সাংসদ ও রাজনীতিক।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে নারীদের দেহমন পুরুষদের থেকে পৃথক। আল্লাহ পাক মহান স্রষ্টা হিসাবে তাকে গৃহভ্যন্তরে সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ ও সেবাধর্মী কাজের উপযোগী করে তৈরী করেছেন- এই কাজগুলো সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন, যুদ্ধের সেনাপতি, আদালতের এ্যাডভোকেট ও ব্যস্ত ব্যাংক কর্মীর কাজ মোটেও উপযুক্ত নয়। তবে কোন মেয়ে যদি শ্যাম ও কুল দুটো ঠিক রেখে অথবা স্বামী-স্ত্রী কাজ ভাগাভাগি করে সংসার সামাল দিয়ে নিজ নিজ পেশায় সফলতা দেখাতে পারে তাহলে তা কিছুকাল চলতে পারে। সেটাকে নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে অনেক স্কলারের আপত্তি রয়েছে। আমার দেখা,অনেক আগ্রহ ও দক্ষতার সাথে ব্যাংক বীমায় কয়েক বছর চাকুরী করার পর স্ব ইচ্ছায় শুধুমাত্র সন্তানদের স্বার্থে চাকুরী ছেড়েছেন,এমন অনেকের কথা জানি। আমার ব্যাংকেই শাখার নেতৃত্বদানের সকল যোগ্যতা থাকার পরও তাদেরকে রাখতে পারিনি কারণ একসময় সংসারের টানে তারা চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হোন।

খাওলা বিনতে ছালাবার সাথে তার স্বামী জিহার করলে রাসুলুলাহ (সাঃ) ছালাবাকে তার স্বামী থেকে আলাদা থাকতে বললেন। তখন ছালাবা রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন- আমার স্বামীর কোন আয় রোজগার নেই। আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে কিভাবে জীবনযাপন করবে? (আত তাবাকাবুল কুবরা)

কাজেই এসব হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে রুটি রুজির-তালাশে মহিলাদের যে কোন উত্তম পেশা নির্বাচনে বাঁধা নেই। বিশেষ করে বর্তমানকালে হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসা (SME) শিক্ষকতা, নার্সিং সেবা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

এর বাইরে ইমিগ্রেশান, শুল্ক ও কর গ্রহীতা ব্যাংকিং হিসাব নিকাশ ইত্যাদি পেশাও তাদের সঙ্গে মানানসই।

রিসেপসানিস্ট, বিক্রয়কর্মী, তথ্য প্রদানকারী, খাদ্য পরিবেশনকারী, গাড়ী চালনা, যন্ত্র কৌশল, বিচার-শালিস এমন সব পেশা নারী চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা এর কয়েকটাতে নারীর সাজসজ্জা প্রকাশ পায় ও কোমল কণ্ঠের আদান প্রদান হয় যা শরীয়াহ সমর্থিত নয় । আর ভারী কাজগুলো তাদের শারীরিক সক্ষমতার বাইরে। আমলা পেশাও পরিবেশ পরিস্থিতি ও কুট কৌশল মানিয়ে নেয়ার বিষয় সে কারণে তাও নারী প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না ।

কর্মক্ষেত্রে নারীর যোগদানের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটা বিষয় অনুসরণীয়-

১. কাজটা মৌলিকভাবে শরীয়ার সুস্পষ্ট সীমা লংঘন করে না

২. কাজটার প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন থাকতে হবে

৩. পুরুষের সাথে যথাসম্ভব কম মেলামেশা ও কথা বিনিময় হতে হবে

৪. শরীয়া নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে কোন বাঁধা দেয়া হবে না

৫. নিজের ইজ্জত ও আব্রুর নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা থাকবে

৬. স্বামী ও মুরুব্বীদের ঐ কাজের প্রতি সমর্থন ও অনুমতি থাকবে

৭. নারীর অসম্মান ও অপমান হয় এমন কর্মে নিয়োজিত হওয়া যাবে না

৮. পথে বা কর্মস্থলে ফিতনা থেকে বিরত থাকতে পারবে

৯. পারিবারিক দায়িত্ব অর্থাৎ স্বামী ও সন্তানাদির সেবার ব্যাপারে চাকরি যেন প্রতিদ্বন্ধী না হয়। ১০. কর্মপরিবেশ নারীর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পথে বাধা হবে না।

পর্দা কি জাতীয় উন্নতির পথে বাধা?

পর্দার বিধান

পর্দা কি আমাদের জাতীয় ও রাষ্টীয় প্রগতির অন্তরায়? এ প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে একটি কথা উত্তমরূপে জেনে নেয়া আবশ্যক যে, প্রকৃতরুপে পর্দা কাকে বলে? কেননা এতদ্ব্যতীত আমরা পর্দার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং তার উপকারিতা অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব না। অতপর আমাদেরকে এ-ও সিদ্ধান্ত নিতে

হবে যে, আমরা মূলত কোন ধরনের প্রগতি অর্জন করতে চাই? কারণ এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে পর্দা তার অন্তরায় কি না তা যথার্থরূপে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

পর্দা আরবী 'হিজাব' শব্দের বাংলা ও উর্দূ তরজমা। কুরআন মজীদের যে আয়াতে মুসলমানদের আল্লাহ তাআলা রাসূলে করীম সা. -এর ঘরে নিঃসংকোচে ও বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন, তাতে এ 'হিজাব' শব্দই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, যদি ঘরের স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে তোমাদের কোন জিনিস নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা হিজাবের আড়াল থেকে চেয়ো। কুরআনের এ নির্দেশ থেকেই ইসলামী সমাজে পর্দার সূচনা হয়। অতপর এ প্রসংগে আর যত আয়াতই নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টিকে আহকামে 'হিজাব' বা পর্দার বিধান বলা হয়েছে। সূরায়ে নূর ও সূরায়ে আহযাবে এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এ সব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহিলারা যেন তাদের মর্যাদা সহকারে আপন ঘরেই বসবাস করে এবং জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো বাইরে নিজেদের রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। তাদের যদি ঘরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, তবে আগেই যেন চাদর (কাপড়) দ্বারা তারা নিজেদের দেহকে আবৃত করে নেয় এবং ঝংকারদায়ক অলংকারাদি পরিধান করে ঘরের বাইরে না যায়। ঘরের ভেতরেও যেন তারা মাহরাম (যার সংগে বিয়ে নিষিদ্ধ) পুরুষ ও গায়রে মাহরাম পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ঘরের চাকর ও মেয়েদের ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেন জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে না বেরোয়।

অতঃপর মাহরাম পুরুষদের সামনে বের হওয়া সম্পর্কেও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তারা বেরোবার পূর্বে যেন কাপড়ের আঁচল দ্বারা তাদের মাথাকে আবৃত করে নেয় এবং নিজেদের সতর লুকিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে পুরুষদেরকেও তাদের মা- বোনদের নিকট যাবার পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন অসতর্ক মুহূর্তে মা-বোনদের দেহের গোপনীয় অংশের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়তে না পারে।

কুরআন মজীদে উল্লেখিত এই সমস্ত নির্দেশকেই আমরা পর্দা বলে অভিহিত করে থাকি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মহিলাদের সতর হচ্ছে মুখমন্ডল, হাতের কব্জা ও পায়ের পাতা ব্যতীত দেহের অবশিষ্টাংশ। এই সতরকে মোহররম পুরুষ এমন কি পিতা, ভাই প্রভৃতির সামনেও ঢেকে রাখতে হবে। মেয়েরা এমন কোন মিহি কাপড় পরিধান করতে পারবে না যাতে তাদের দেহের গোপনীয় অংশ বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হতে পারে। তাছাড়া তাদেরকে মোহররম পুরুষ ছাড়া অন্য

কারো সাথে ওঠা বসা কিংবা ভ্রমণ করতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

কেবল তাই নয়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে সুগন্ধি মেখেও ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি মসজিদে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক স্থান পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। নারী ও পুরুষকে মিলিতভাবে একই কামরায় বা একই স্থানে সালাত আদায়ের তিনি কখনো অনুমতি প্রদান করেননি। এমন কি সালাত শেষে খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহাবাগণ মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে আগে বের হওয়ার সুযোগ দিতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মসজিদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বের না হতেন ততক্ষণ পুরুষরা তাঁদের কামরার ভেতরেই অপেক্ষা করতেন।

পর্দার এই সমস্ত বিধান সম্পর্কে যদি কারো মনে সংশয় থাকে, তা'হলে তিনি কুরআনের সূরায়ে নূর ও সূরায়ে আহযাব এবং হাদীসের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন। বর্তমান সময়ে আমরা যাকে পর্দা বলে অভিহিত করে থাকি, তার বাহ্যিক রূপে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু মূলনীতি ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার দিক দিয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মদীনার ইসলামী সমাজে প্রবর্তিত পর্দা ব্যবস্থারই অনুরূপ রয়ে গেছে।

বস্তুত পর্দা সম্পর্কে আমাদের মনে যদি এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তাহলে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়ারই বা আমাদের কি অধিকার আছে? আর যে আল্লাহ এবং রাসূল আমাদের উপর এমনি একটি 'নিপীড়নমূলক' ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই বা আমরা অনাস্থা জ্ঞাপন করি না কেন? বস্তুত এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে, আল্লাহ এবং রাসূল মূলতই পর্দার কোন নির্দেশ দেননি।

পর্দার উদ্দেশ্য

ইসলামে যে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, তৎসম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে আমরা তার তিনটি উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারিঃ

প্রথমত: নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হেফাজত করা এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সবের প্রতিরোধ করা।

দ্বিতীয়ত: নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে পৃথক করা, যেন প্রকৃতি নারীর ওপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তা সে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।

তৃতীয়ত: পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করা। কারণ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আর যত ব্যবস্থাই রয়েছে তার মধ্যে পারিবারিক ব্যবস্থা শুধু অন্যতমই নয়; বরং এ হচ্ছে গোটা জীবন ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ। তাই যে দেশে বা যে সমাজে পর্দাকে বিসর্জন দিয়ে পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা চলেছে, সেখানে মেয়েদেরকে শুধু পুরুষদের দাসী ও পদসেবিকাই বানানো হয়েছে এবং তাদেরকে সমস্ত ন্যায্য অধিকার প্রদানের নামে পর্দার বাঁধন থেকে আযাদ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পারিবারিক ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে গুরুতর বিশৃংখলা। ইসলাম নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদানের সংগে সংগে পারিবারিক ব্যবস্থাকেও সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই যে পর্যন্ত নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা না থাকবে, সে পর্যন্ত ইসলামের উদ্দেশ্য মোটেই সফল হতে পারে না।

অবশ্য যদি কেউ নৈতিক চরিত্রের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে না করেন, তবে তার সে ব্যাধির কোন প্রতিষেধক আমার কাছে নেই। কিন্ত যিনি নৈতিকতাকে জীবনের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেন, তাঁর একথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যে সমাজে মেয়েরা চোখ ঝলসানো পোশাক পরিচ্ছেদ ও অলংকারাদিতে সুসজ্জিতা হয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের রূপ যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়ায় এবং সর্বত্র পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ পায়, সেখানে তাদের চারিত্রিক মেরুদন্ড ধ্বংসের কবল থেকে কিরূপে রক্ষা করা যেতে পারে? আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে থাকেন, তারা অনায়াসেই আমার এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আমাদের সমাজ জীবনে যেসব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার মূলে নাকি রয়েছে পর্দাপ্রথা এবং পর্দার ব্যবস্থা না থাকলে মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের নাকি মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হত। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করেন, তারা যে নিতান্তই ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন । কারণ, যে সমাজে পর্দা প্রথাকে বিসর্জন দিয়ে নারীকে সম্পূর্ণ ‘আযাদ’ করে দেয়া হয়েছে, সেখানে পুরুষের মনে সম্ভ্রমবোধ জাগা তো দূরের কথা, বরং নারীর মহান মর্যাদাকেই সেখানে নগ্নতা ও উলংগতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানো হয়েছে। এমনকি, তাতেও যেখানে মানুষের যৌন লালসা নিবৃত্ত

হয়নি, সেখানে প্রকাশ্য ব্যভিচারকেই উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কিরূপ ভাঙন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে, তা আপনারা বৃটেন, আমেরিকা এবং তাদের অনুসারী তথাকথিত প্রগতিশীল দেশগুলোর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেই সম্যক অনুধাবন করতে পারেন। আমার মা-বোনদের নিকট জিজ্ঞাস্য যে, পর্দা প্রথাকে বিসর্জন দিয়ে এহেন প্রগতিই কি তারা কামনা করেন?

বস্তুত এটা শুধু নৈতিক প্রশ্নই নয়; বরং এর সংগে আমাদের গোটা তাহযীব-তামাদ্দুন জড়িত রয়েছে। অধুনা দেশে নারী-পুরুষের মিলিত আচার অনুষ্ঠানের মাত্রা যত বেড়ে চলেছে, মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যয় বাহুল্য ততই উর্ধমূখী হচ্ছে। এর ফলে একদিকে হালাল উপায়ে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, অপরদিকে সুদ, ঘুষ আত্মসাৎ, চোরাকারবারী প্রভৃতি সমাজধ্বংসী পাপাচারেরও ব্যাপক প্রচলন হচ্ছে।

বলাবাহুল্য এই সমস্ত হারামখুরীর অভিশাপেই আজ আমাদের সামাজিক কাঠামো ঘুণে ধরা কাঠের ন্যায় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে আজ দেশে আইনের শাসনও সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

নারী ও পুরুষের কর্মবন্টন

বস্তুত নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে খোদ প্রকৃতিই স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। প্রকৃতি মাতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব সম্পূর্ণ নারীর উপর সোপর্দ করেছে এবং সেই সংগে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত স্থান কোথায়, তাও বাতলিয়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে পিতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের ওপর এবং সেই সংগে মাতৃত্বের মতো গুরুদায়িত্বের বিনিময়ে তাকে আর যেসব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাও প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। উপরোক্ত এ উভয় প্রকার দায়িত্ব পালনের জন্য নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন, শক্তি সামর্থ ও ঝোঁক প্রবণতায়ও বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতি যাকে মাতৃত্বের জন্য সৃষ্টি করেছে, তাকে ধৈর্য, মায়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলো বিশেষ ধরনের গুণে গুণান্বিত করেছে। নারীর ভেতরে এসব গুণের সমন্বয় না হলে তার পক্ষে মানব শিশুর লালন পালন করা সম্ভবপর হত কি? বস্তুত মাতৃত্বের মহান দায়িত্ব যার উপর অর্পণ করা হয়েছে; তার পক্ষে এমন কোন কাজ করা সম্ভব নয়, যার জন্যে রুক্ষতা ও কঠোরতার প্রয়োজন। এ কাজ শুধু তার দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে, যাকে এর উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেই সংগে পিতৃত্বের মতো কঠোর দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

নারীকে তার মাতৃসুলভ দায়িত্ব পালনের সংগে সংগে পরুষের মতো রাজনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকার্য, যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন, তাহলে তার প্রতি নি:সন্দেহে চরম অবিচার করা হবে।

নারীর ওপর প্রকৃতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তা নি:সন্দেহে মানবতার অর্ধেক সেবা এবং এই সেবাকার্য সে সাফল্যের সংগেই সাধন করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরুষের নিকট থেকে সে বিন্দুমাত্র ও সহযোগিতা পচ্ছে না, অথচ অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক দায়িত্ব ও আবার আপনারা নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। এর ফল এ দাঁড়াবে যে, নারীকে পালন করতে হবে মোট দায়িত্বের তিন চতুর্থাংশ এবং পুরুষের ওপর বর্তাবে মাত্র এক-চতুর্থাংশ।

অবশ্য মেয়েরা এ যুলুম অবিচারকে মেনে নিচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ যুলুমের বোঝাকে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য লড়াই করছে তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তারা পুরুষদের কাছে যথার্থ সমাদর পাচ্ছে না। ঘর সংসার ও মাতৃত্বের মতো কঠিন দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করা সত্ত্বেও আজ তারা সমাজে উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়। সন্তানবতী ও গৃহিনী মেয়েদেরকে আপনারা ঘৃণা করেন এবং স্বামী ও সন্তান-সন্ততির এত সেবা -যত্ন করা সত্ত্বেও আপনারা তাদের যথার্থ কদর করছেন না। অথচ এই সমস্ত কার্যে তাদের যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা পুরুষদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত দায়িত্বের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। বস্তুত এসব কারণেই মেয়েরা আজ অনন্যোপায় হয়ে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হচ্ছে। তারা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে যে, পুরুষ-সুলভ কার্যে অগ্রসর না হলে সমাজে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা নেই।

নারী ও প্রগতি

ইসলাম মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার দরুন নারীকে শুধু পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়নি, বরং কোন কোন পুরুষের চাইতেও বেশী মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এটাকে আপনারা প্রগতির অন্তরায় বলে উপেক্ষা করছেন। আপনাদের দাবী হচ্ছে, নারী মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করবে, মাজিষ্ট্রেট হয়ে জেলার শাসন কার্যও পরিচালনা করবে এবং নর্তকী ও গায়িকা হয়েও আপনাদের চিত্তবিনোদনও করবে। কী অদ্ভুত আপনাদের খেয়াল!

বস্তুত আপনারা নারীর ওপর দায়িত্বের এরূপ দুরূহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে সে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারছে না। আপনারা তাকে এমন সব কাজে নিযুক্ত করছেন, যা জন্মগতভাবেই তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, আপনারা তাকে

তার সুখের নীড় থেকে টেনে এনে প্রতিযোগিতার ময়দানে দাঁড় করাচ্ছেন, যেখানে পুরুষের মুকাবিলা করা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি এই দাড়াবে যে, প্রতিযোগিতামূলক কাজে সে পুরুষের পেছনে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর যদি কিছু করতে সক্ষম হয় তবে তা নারীত্বের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়েই করতে হবে।

তথাপি এটাকেই আপনারা প্রগতি বলে মনে করেন আর এই তথাকথিত প্রগতির মোহেই আপনারা ঘর সংসার ও পারিবারিক জীবনের মহান কর্তব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছেন। অথচ এই ঘর-সংসারই হচ্ছে মানব তৈরীর একমাত্র কারখানা । এ কারখানার সাথে জুতা কিংবা পিস্তল তৈরির কারখানার কোন তুলনাই চলে না। কারণ এ কারখানা পরিচালনার জন্য যে বিশেষ ধরনের গুণাবলি, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা আবশ্যক, প্রকৃতি তার বেশীর ভাগ শক্তিই দিয়েছেন নারীর ভেতরে। এ কারখানার পরিসর বিস্তৃত-কাজও অনেক। যদি কেউ পরিপূর্ণ দায়িত্বানুভুতি সহাকারে এ কারখানার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তার পক্ষে বাইরের দুনিয়ায় নযর দেয়ার আদৌ অবকাশ থাকে না; বস্তুত এ কারখানাকে যতখানি দক্ষতা ও নৈপূন্যের সাথে পরিচালনা করা হবে, ততখানি উন্নত ধরনের মানুষই তা থেকে বেরিয়ে আসবে। কাজেই এ কারখানা পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা ও ট্রেনিংই নারীর সবচাইতে বেশী প্রয়োজন।

এ জন্যেই ইসলাম পর্দাপ্রথার ব্যবস্থা করেছে। মোদ্দাকথা, নারী যাতে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চালিত না হয় এবং পুরুষও যাতে নারীর কর্মক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতে না পারে, তাই হচ্ছে পর্দার লক্ষ্য।

আপনারা আজ তথাকথিত প্রগতির মোহে পর্দার এ বিধানকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু আপনারা যদি এ উদ্দেশ্যে অটল থাকতে চান, তাহলে এর পরে দুটি পথের একটি আপনাদের অবলম্বন করতে হবে। হয় ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করে আপনাদের হিন্দু কিংবা খৃষ্টানদের ন্যায় নারীকে দাসী ও পদসেবিকা বানিয়ে রাখতে হবে। নতুবা দুনিয়ার সমস্ত মানব তৈরির কারখানা ধ্বংস হয়ে যাতে জুতা কিংবা পিস্তল তৈরীর কারখানা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

প্রগতি একটি ব্যপক অর্থবোধক শব্দ। এর কোন নির্দিষ্ট কিংবা সীমাবদ্ধ অর্থ নেই। মুসলমানরা এক কালে বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্তা ছিল । সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানে তারাই ছিল দুনিয়ার শিক্ষা গুরু। সভ্যতা ও কৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন জাতিই তাদের সমকক্ষ ছিল না।

আপনাদের অভিধানে ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জল যুগকে প্রগতির যুগ বলা হয় কিনা জানি না। তবে সেই যুগকে যদি প্রগতির যুগ বলা যায় তাহলে বলা যায় পর্দার পবিত্র বিধানকে পুরোপুরি বজায় রেখেই তখনকার মুসলামনরা এতটা উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইসলামের ইতিহাসে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তানায়ক, আলেম ও দিগ্বীজয়ী বীরের নাম উজ্জল হয়ে রয়েছে। সেসব বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই তাদের মূর্খ জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হননি। শুধু তাই নয়, ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বহু খ্যাতনামা মহিলার নামও দেখতে পাই, সে যুগে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে দুনিয়ায় অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের এই উন্নতি ও প্রগতির পথে পর্দা কখনই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। সুতরাং আজ যদি আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রগতি অর্জন করতে চাই তাহলে পর্দা আমাদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে কেন?

পর্দাহীনতার পরিণতি

অবশ্য পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের বল্গাহীন জীবনধারাকেই যদি কেউ 'প্রগতি' বলে মনে করেন তাহলে তার সে প্রগতির পথে পর্দা নি:সন্দেহে প্রতিন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা পর্দার বিধান মেনে চললে পাশ্চাত্য কায়দার প্রগতি অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন, এ তথাকথিত প্রগতির ফলেই পাশ্চাত্যবাসীদের নৈতিক ও পারিবারিক জীবন আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সেখানে নারীকে তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে এনে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে নারীও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে-অফিস আদালত ও কল-কলখানার কাজে কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে বটে। কিন্তু সেই সংগে সেখানকার পারিবারিক জীবন থেকেও শান্তি শৃংখলা বিদায় নিয়েছে। তার কারণ, যে সকল নারীকে অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় তারা কখনো পারিবারিক শৃংখলা বিধানের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না, আর তা সম্ভবও নয়।

এ জন্যেই আজ পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা পারিবারিক জীবনের চাইতে হোটেল, রেস্তোরা ও ক্লাবের জীবনেই বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে বহু মানব সন্তান ক্লাব রেস্তোরাতেই জন্মগ্রহণ করে, আর ক্লাব-রেস্তোরাঁতেই জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মাতা-পিতার স্নেহ মমতা তারা কোনদিনও উপভোগ করতে পারে না। অপরদিকে দাম্পত্য অশান্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং যৌন অনাচার সেখানে এরূপ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, আজ সেখানকার মনীষীরাই তাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে

আতঁকে উঠছেন। মোদ্দাকথা, পশ্চিমা সভ্যতা বাহ্যিক চাকচিক্যের পশ্চাতে মানুষের জীবনধারাকে এমনি এক পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছে, যেখানে মানবতার ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এরূপ বল্গাহীন ও উচ্ছৃংখল জীবন ধারাকে যদি কেউ প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করেন, তবে তিনি তা সানন্দেই গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম এরূপ অভিশপ্ত জীবনকে আদৌ সমর্থন করে না।

নারীদের উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান

রাসূল (সা) বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুমিন নর নারীর জন্য ফরজ।" এখানে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। একটি সভ্যতা বা একটি উম্মত কখনোই একটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে না। রাসূলে আকরাম (সা) মদীনাকে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। নারী এবং পুরুষ উভয়ই সেখানে একসাথে জ্ঞানার্জন করেছেন।

নারী ও পুরুষকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কখনোই বিভাজন করা যাবে না, কাউকে কোনো ধরনের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আমাদের পুরুষ আলেমের যতটুকু প্রয়োজন, মহিলা আলেমের ততটুকুই প্রয়োজন। যে জাতি তার নারীদেরকে মূর্খ বানিয়ে রাখে সেই জাতির দ্বারা কখনোই কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ গঠনকারী, প্রজন্ম গঠনকারী হচ্ছে নারীগণ। যে জাতি মহিলাদের মূর্খ রাখবে, তাদের পরবর্তী প্রজন্মও মূর্খ হবে— এটাই তো স্বাভাবিক ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নারী এবং পুরুষকে একই মূল থেকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিগত দিক থেকে নারী এবং পুরুষ সমান এবং তাদের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করবো।' তিনি কখনই বলেননি যে শুধুমাত্র পুরুষরা খলিফা হবে, নারীরা খলিফা হবে না।

পুরুষরা যতটুকু আল্লাহর খলিফা, নারীরাও ততটুকুই আল্লাহর খলিফা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন ওহী পাঠিয়েছেন সেটি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য পাঠাননি। সেটি তিনি নারীদের জন্যও পাঠিয়েছেন। ওহীর উদ্দেশ্যগত দিক থেকে নারীরাও আল্লাহর উদ্দেশ্য, পুরুষরাও আল্লাহর উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদানের যে দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পিত হয়েছে, সেই দায়িত্ব তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে 'মুমিন নারী এবং মুমিন পুরুষ একজন আরেকজনের বন্ধু। একজন আরেকজনের সহযোগী। তারা একসাথে সত্যের আদেশ এবং অপকর্মের বিরোধিতা করবে' (সূরা আত তাওবা)— এ কথাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি আইডিওলজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, শিরক, দাসত্ব, সাম্প্রদায়িকতা বা বর্ণবাদ ও জেন্ডারইজম তথা নারীকে ছোট করে দেখা। শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে কাউকে ছোট করে দেখা একটি চরম জাহেলি চিন্তা।

রাসূল (সা) এমন এক সময়ে এই সকল ভ্রান্ত আইডিওলজির মোকাবেলা করেছেন, যখন তারা কন্যাশিশুদেরকে জীবন্ত কবর দিতো। শুধু নারীদের সাথে কথা বলার জন্য মসজিদে নববীতে তিনি সপ্তাহের দিন ধার্য করেছিলেন। সেই দিন তিনি তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদেরকে লেখাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) সাহাবীদের মধ্যে সবচাইতে বড় আলেম ছিলেন। তিনি ২২২০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুরআনের কিছু কিছু আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সাক্ষী হিসেবে ছিলেন। তিনি ছিলেন কিছু কিছু আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য।

পরবর্তীতে জেন্ডারইজম তথা 'জিনছি' চিন্তা মাঝেমধ্যে মুসলমানদের উপর আপতিত হয়েছে। এমনকি এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য তারা এ রকম বানোয়াট হাদীস পর্যন্ত সৃষ্টি করেছে— "তোমরা তাদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দিও না।" যে গ্রন্থ নাযিল হওয়া শুরুই হয়েছে 'ইকরা' (পড়) দ্বারা, সেই গ্রন্থ কীভাবে মুমিনদের অর্ধেককে বলতে পারে যে তোমরা পড়তে ও লিখতে পারবে না? এটা কীভাবে সম্ভব?

ইমাম বুখারীর উস্তাদদের মধ্যে নয় জন নারী উস্তাদ ছিলেন। এই নয় জন নারী থেকে তিনি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। ইলমুল হাদীসে অনেক নারী রাবী রয়েছেন।

নারী হওয়ার কারণে তাদেরকে নিচু করে দেখা, খাটো করে দেখা, এ ধরনের যত কথা আছে এগুলো রাসূলুল্লাহর কথা হতে পারে না। নারীদের আকলে কমতি আছে, নারীদের আকলে ঘাটতি আছে, এ রকম কোনো রেওয়ায়েতই আল্লাহর রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আল্লাহর রাসূলের (সা) নামে এ রকম কোনো রেওয়ায়েত নেই। 'মহিলারা দ্বীনের ক্ষেত্রে অর্ধেক'— এ ধরনের কোনো রেওয়ায়েতকে আল্লাহর রাসূলের (সা) সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে তারা ভুল বুঝে, ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে নিজেদের স্বার্থের জন্য। এই সকল রেওয়ায়েতসমূহ 'কুল্লি আসাস' তথা সামগ্রিকতার মূলনীতির ভিত্তিতে বুঝতে হবে ।

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে ‘নারীদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে’ এটা কখনোই বলতে পারবেন না। কেউ এমনটি বললে বুঝতে হবে, তিনি ঐ হাদীসকে আদৌ বুঝতে পারেননি।

আমাদের মেয়েদেরকে সকল ধরনের মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু একটি খারাপ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যেন তাদেরকে আমরা দশটি খারাপের মধ্যে নিপতিত না করি। সবচাইতে বড় খারাপ বিষয় হচ্ছে মূর্খতা। আমরা জাহালতকে কখনোই আমাদের নারীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না।

আধুনিকতার নামে নারীর প্রতিবন্ধকতা

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে অগ্রসর করে নেওয়া, স্বাধীনতা দেওয়া এবং নারীর ক্ষমতায়নের নামে বরং নারীকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং বহু ক্ষেত্রে তারা নির্যাতিত। যেসব ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এখনো নারীর পাশে দাঁড়াতে পারেনি, তাহলো-

১. ঘরের বাইরে নারীর চলাফেরায় নিরাপত্তা।

২. পাচারের শিকার হওয়া থেকে নিরাপত্তা।

৩. জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা থেকে নিরাপত্তা।

৪. যৌন হয়রানির শিকার থেকে নিরাপত্তা।

৫. স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর ও ননদ কর্তৃক নববিবাহিতা, গর্ভবতী নারী কিংবা সাধারণ নারীকে নির্যাতন থেকে মুক্তির নিরাপত্তা।

৬. যৌতুকের বলি হয়ে মৃত্যুবরণ করাও রোধ হয়নি।

৭. স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত নারীরা।

৮. অধিকাংশ নারীই পায় না মোহরানার অধিকার। এমনকি আধুনিক সমাজ মোহরানা ছাড়াই কিংবা প্রতীকী এক টাকা/সামান্য গিফট ইত্যাদি নজির গড়ে নারীকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা হওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।

৯. মেয়ে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ গৃহপরিচারিকার কাজ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা। বরং অনেকক্ষেত্রে যারা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নে আওয়াজ তুলছে, তারাই এ মেয়ে শিশু শ্রমিক অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

১০. আজও নারীদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না।

১১. আধুনিক সভ্যতায় এ যুগে নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার উচ্চ আওয়াজের এ সময়েও নারীদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১২. এমনকি ধর্মীয় অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয় নারীকে।

১৩. অহরহ ঘটে চলেছে ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ তালাকের অপব্যবহার।

নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতায় করণীয়

সুতরাং নারী এসব নির্যাতন রোধে ইসলাম দিয়েছে সঠিক ও সুন্দর দিকনির্দেশনা। ইসলাম নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এমনকি ইসলামি শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষের মতো শ্রম-সাধনা করায় নারীর সমান অংশগ্রহণের অনুমতিও রয়েছে।

ইসলামে নারীরা তাদের মান মর্যাদা ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজরে নিশ্চয়তাই পায় না বরং নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পায় সঠিক দিকনির্দেশনা। নিরাপত্তা, অধিকার ও স্বাধীনতায় কোরআনুল কারিমের নির্দেশনাগুলো এমন-

>>নারীর নিরাপত্তায় করণীয়ঃ

নারীর সার্বিক নিরাপত্তার বিধান দিয়েছে ইসলাম। রাস্তায়, কর্মস্থলে ও যত্রতত্র নারীদের হয়রানি করা তো দূরের কথা বরং ইসলাম নারীদের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেও কঠোর নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

’হে রাসুল! আপনি) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।‘ (সুরা নুর : আয়াত ৩০)

আর কেউ যেন নারীকে হয়রানি না করে সে জন্য নারীকে বোনের দৃষ্টিতে দেখার ঘোষণা দেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন-

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال

’নারীরা পুরুষদের সহোদরা (বোন)।’ (আবু দাউদ)

>> ব্যভিচার-ধর্ষণ-অপবাদ প্রতিরোধ

ইসলাম ব্যভিচার, দেহব্যবসা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনীকে নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামে নারীকে ধর্ষণ করা কিংবা ধর্ষণের চেষ্টা করা এবং নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি ঘোষণা করেছে। যাতে খারাপ

চিত্তের পুরুষগণ এসব অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকে। একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

১. وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩২)

২. وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছাকাছি যেও না।।' (সুরা আল-আনআম : আয়াত ১৫১)

৩. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।' (সুরা নুর : আয়াত ১৯)

৪. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।' (সুরা নুর : আয়াত ২৩)

>> নারীর অধিকার বাস্তবায়নে ইসলাম

নারী অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ অধিকার সম্পদের, সম্মানের, নেতৃত্বের, দাম্পত্য জীবনের, সমাজের। এ অধিকার আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। চাইলে যে কেউ নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। নারীর অধিকারের বিষয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই-এর অধিক, তবে তাদের জন্য ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের বাবা-মার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের ছেলে থাকে। যদি ছেলে না থাকে এবং

বাবা-মা ওয়ারিস হয়, তবে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। ওসিয়ত পূরণ করার পর; যা (ওসিয়ত) করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের বাবা ও ছেলের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা নিসা : আয়াত ১১)

এ আয়াতে নারী ক্ষেত্র বিশেষ যেমন পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে; আবার বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর সমান অর্ধেক সম্পত্তিও পাবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঘোষণা করেছে ইসলাম।

>> মোহরের অধিকার

নারীর মোহরানার অধিকার সম্পর্কেও ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

১. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন।' (সুরা আহজাব : আয়াত ৫০)

২. وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।' (সুরা নিসা : আয়াত ৪)

৩. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা (মোহর) ফরজ করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (সুরা আহজাব : ৫০)

>> নারীর নির্যাতনের প্রতিরোধ

নারীকে যে কোন ছুঁতোয় দৈহিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে নির্যাতন করা ইসলামি শরীয়তে বৈধ নয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে তার কোনো স্ত্রী কিংবা কন্যার গায়ে হাত তোলেননি।

আবার বাসা-বাড়িতে কর্মরত কাজের মেয়ে কিংবা বুয়ারাও ক্রীতদাসী নয়। ইসলামে ক্রীতদাস প্রথাবিলোপ করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাস-দাসীদের ব্যাপারে বিশেষ নসিহত পেশ করেছেন-

'তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দেবে।' (মুসনাদ আহমাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা)

>> নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়ার শাস্তি

ইসলামে নারীকে অপবাদ দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফারমান।' (সুরা নুর : আয়াত ৪)

>> তালাকের অপব্যবহার প্রতিরোধ

স্বামী-স্ত্রীর অস্বস্তিকর জীবনের সুন্দর সমাধানের জন্য ইসলাম তালাকের বিধান রেখেছে। স্বামীর হাতে যদিও তালাকে প্রাথমিক অধিকার ন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু সে অধিকার অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করাও ইসলামি শরিয়তে আরেকটি অন্যায় ও গোনাহের কাজ হিসেবে বিবেচিত।

আমরা জানি বিয়ে যেভাবে সামাজিক সমঝোতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে ঠিক তেমনি তালাকও উভয়ের বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এ ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো এমন-

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

’যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।’ (সুরা নিসা : আয়াত ৩৫)

অতঃপর করণীয় কী হবে? এ সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা বলেন-

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

’তালাকে-‘রাজঈ' হলো- দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না; অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ২২৯)

>> পরকালের জবাবদিহিতা

সর্বোপরি পরকালের জবাবদিহিতা নারীর অধিকার, সম্মান, স্বাধীনতা ইত্যাদি সযোগ-সুবিধা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কারণ নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই পরকালে তার কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

সুতরাং যে বা যারা নারী কিংবা পুরুষ নির্যাতন করে থাকে; তাদের এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, এ নির্যাতনের জন্য অবশ্যই তাকে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আর এ জবাবদিহিতাই মানুষকে নারী/পুরুষ নির্যাতনসহ যে কোনো অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। জবাবদিহিতা থাকলে নারী-পুরুষ সবাই উত্তম চরিত্রের মুসলিমে পরিণত হবে, ইন শা আল্লাহ।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর উচিত, নারীর নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সম্মান ও নির্যাতনরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা মেনে চলা জরুরি। তবেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী পাবে সম্মান, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা।

কথিত নারী স্বাধীনতা বনাম ইসলামে নারীর ভূমিকাঃ

ইসলামে নারীকে পরিপূর্ন মর্যাদা দিয়ে সামগ্রীক জীবন বিধান প্রদান করেছে। কিন্তু আধুনিকতার নামে নারীদেরকে বিভিন্ন ফিতনায় জড়ানো হচ্ছে। অপরদিকে ইসলাম নারীকে দিচ্ছে দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার পথ। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। আল্লাহ তাআলা কুরআনে মাজীদে এরশাদ করেন,
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বল, তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।” (সূরা আহযাবঃ ৬০)

বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা সমাজে কেমন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বস্তুতে পরিণত করেছে তা আমরা আমাদের চারদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিবাহ-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি সবকিছুর পেছনেই একটি প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা।

যদিও ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে না বুঝার কারণে কেউ কেউ একে পশ্চাৎপদতা, সেকেলে, নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের পন্থা, উন্নয়নের অন্তরায় এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। মূলতঃ এই ভুল বুঝাবুঝির জন্য মুসলিম বিশ্বের কতিপয় এলাকায় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার অপপ্রয়োগ আর পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকাই দায়ী। পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি একটা কুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা হয়। আর তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এই অঞ্চলেও অনেকে পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। একজন খ্রীষ্টান ‘নান’ বা ধর্মজাজিকা যখন লম্বা গাউন আর মাথা-ঢাকা পোশাক পড়ে থাকেন তখন তা আর পশ্চাৎপদতা, উন্নয়নের অন্তরায় বা নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের প্রয়াস বলে বিবেচিত হয় না। বরং তা শ্রদ্ধা, ভক্তি বা মাতৃত্বের প্রতীক রূপেই বিবেচিত হয়।

অতএব, ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা নারীকে শৃঙ্খলিত করার পরিবর্তে তাঁকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ইসলাম নারীকে কিরূপ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বা পর্দাপ্রথা নারীকে কী মর্যাদা দিয়েছে সে

বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আসুন আমরা দেখি, তথাকথিত প্রগতি, নারী-স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কী দান করেছে। বর্তমান যুগে, বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে নারীকে তাঁর নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে তাল-মিলিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বা efficient বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিই কি নারী লিঙ্গ-বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে? 'কলঙ্কময় অতীতের' নিগ্রহ ও দমন-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? তথাকথিত নারী-স্বাধীনতা কি নৈতিকতা সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? সত্যিই কি নারী প্রকৃত সামাজিক ন্যায়-বিচার লাভে সমর্থ হয়েছে? আমরা যদি বর্তমান পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে : 'না'।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই এককালের 'সেকেলে' বা 'out dated family concept' বা পারিবারিক প্রথা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। নারী-নির্যাতন, শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাসক্তি, কুমারী-মাতৃত্ব বা single mother, ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য-সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। কেবল পাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয়, আজ আমাদের সমাজেও এ-সকল ব্যাধির ক্রমশ সংক্রমন ঘটছে।

বাহ্যিক চাকচিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ করতে পারলেই আমরা সেই অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো দেখতে পাই। প্রচলিত সাধারণ ধারণায় বিংশ শতাব্দি, বিশেষ করে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই সময়ে বিশ্বে নারী-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা পঁচিশ ভাগ। এ বিষয়ে এখানে কয়েকটি জরিপের উল্ল্যেখ করা হলোঃ

(১) গর্ভপাতঃ

১৯৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডে গর্ভপাতকে বৈধতা প্রদান করার পর সেখানে কেবল রেজিস্টার্ড গর্ভপাতের ঘটনাই বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ। এর মধ্যে মাত্র শতকরা একভাগ (১%) স্বাস্থ্যগত কারণে আর বাকী ৯৯%-ই অবৈধ গর্ভধারণের কারণে ঘটেছে। ১৯৬৮ সালে যেখানে ২২,০০০ রেজিস্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো হয় সেখানে ১৯৯১ সালে এক লক্ষ আশি হাজার আর ১৯৯৩ সালে তা দাঁড়ায় আট লক্ষ উনিশ হাজারে। এর মধ্যে পনের বছরের কম বয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন হাজার। এটা তো গেল যুক্তরাজ্যের অবস্থা। এখন আসুন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সেখানকার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ।

রেজিস্টার্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র ১৯৯৪ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে দশ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয়। The Alan Guttmachere Institute নামের একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের মতে প্রকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা উক্ত সংখ্যার তুলনায় ১০%-২০% বেশি। এক্ষেত্রে কানাডার পরিস্থিতি কিছুটা 'ভালো'। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক। তবে জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুন । অর্থাৎ, জাপানে প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ রেজিস্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো হয়ে থাকে। তথাকথিত সভ্য-জগতে 'ইচ্ছার স্বাধীনতা'-র জন্য বিগত ২৫ বছরে এক বিলিয়ন অর্থাৎ দশ কোটিরও অধিক ভ্রূণকে হত্যা করা হয়। উক্ত সংখ্যা কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড পরিসংখ্যান থেকে নেয়া হয়েছে । প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ। 'বর্বরযুগে' কন্যা-সন্তানদের হত্যা করা হতো অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু আজ তথাকথিত সভ্য-জগতে ব্যাভিচার, অবৈধ-মিলন আর অনৈতিকতার চিহ্ন মুছে ফেলতে এইসব হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। এ-সবই হলো বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল।

(২) ধর্ষণঃ

ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী এ-বিষয়ে রিপোর্ট করে না। ফলে, যে-সংখ্যা পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক বেশি ঘটে। ব্রিটিশ পুলিশের মতে ১৯৮৪ সালে, এই এক বছরে, বৃটেনে ২০,০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক নিগ্রহ এবং ১৫০০ (পনের শ') ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। The London Rape Crisis Center -এর মতে বৃটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার চাইতেও বেশি। ১৯৯৪ সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২,০০০ হাজারে। উক্ত সংস্থার মতে "If we accept the highest figures, we may say that, on average, one rape occurs every hour in England." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ। এখানে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। সে সংখ্যা জার্মানীর সংখ্যার চাইতে চারগুণ, বৃটেনের চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে প্রায় বিশগুণ বেশি। সবচাইতে উদ্বেগজনক এবং বাস্তবতা এই যে, ৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬% নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা। National Council for Civil Liberties নামক সংস্থার মতে ৩৮% ক্ষেত্রে পুরুষ তাঁর অফিসিয়াল ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ করে থাকে। আর ৮৮% মহিলা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে থাকেন। এই হলো তথাকথিত উন্নত ও নারী-স্বাধীনতার দাবীদার দেশগুলোর অবস্থা।

(৩) বিবাহ-বিচ্ছেদঃ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিবাহপূর্ব সহবাস এবং 'Live Together' -এর প্রবণতা বৃদ্ধি

পেতে থাকে। ১৯৬০ সালে জন্ম গ্রহণকারী বৃটেনের নারীদের প্রায় অর্ধেক প্রাক-বিবাহ সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর পক্ষে তাঁদের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে নর-নারী একে অপরকে ভালোভাবে জানতে পারে এবং এর পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা স্থায়ীত্ব লাভ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে, ১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ আট হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় এগার লক্ষ পঁচাত্তর হাজারে। পক্ষান্তরে, বিবাহের হারে তেমন কোনো উল্ল্যেখযোগ্য-সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি।

(৪) কুমারী-মাতৃত্ব ও একক-মাতৃত্বঃ
পশ্চিমা-বিশ্বের তথাকথিত "নারী স্বাধীনতার" আরেক অভিশাপ হলো কুমারী-মাতৃত্ব। বৃটেনে এক জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় দুই লক্ষ পনের হাজারে। ১৯৯২ সালে জন্ম নেওয়া শিশুদের ৩১% ছিল অবিবাহিতা মাতার সন্তান। এই অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের মধ্যে আড়াই হাজারের বয়স ১৫ (পনের) বছরের নীচে। বৈধ বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর তুলনায় অবৈধ শিশুর জন্মের হারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা একক-মাতৃত্বের (single mother) উপর। নারীর উপর কুমারী-মাতৃত্বের এই দায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী-নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ।

(৫) মদ্যপান ও ধুমপানঃ
পশ্চিমা ধাঁচের নারী-পুরুষের সমানাধিকার নারী সমাজের মধ্যে অনেক মন্দ অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে। একসময় মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল পুরুষের বদঅভ্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু আজ নারীও তাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। The Sunday Times – এর এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারীরা "নির্দ্ধারিত মাত্রার" চাইতে অধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা এবং পরিমাণ পুরুষের সমান সমান।

(৬) বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফীতে:
তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে

বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং পর্নোগ্রাফীতে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা-জগতের ঘুনেধরা সমাজের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাস্তবচিত্র তার চাইতেও আরো অনেক বেশি ভয়াবহ। অর্থনৈতিক চাকচিক্য আর প্রযুক্তিগত উন্নতির আড়ালে তথাকথিত ‘আধুনিক’ বিশ্বের সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় আজ ধ্বস নেমেছে। নারী-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে’ ভোগের সামগ্রী হিসাবে। এথেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ অনুসরণ।

বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা আহযাবের যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি সেখানে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এবং মুমেনগণকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ যেন চাদর দ্বারা নিজেদের শরীর ঢেকে রাখে। যার মধ্যে তাঁদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশান্তি।

অনেকে ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে না বুঝার কারণে একে নানাভাবে সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম-সমাজে নারীদের উপরে একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যার ফলে, তাঁরা মানবীয় কার্যাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। পর্দাপ্রথা এবং নারী-পুরুষের পৃথকীরণের ইসলামী ধারণাকে বুঝতে হলে তা বুঝতে হবে নারীদের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রেক্ষাপটে, যার মাধ্যমে ঐসব উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের আশঙ্কা তিরোহিত হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস’ানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (সূরা নূর : ৩১)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর : ৩২)

আমরা দেখেছি যে, আপাত দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত অপরাধের ফল নারীকেই এককভাবে ভুগতে হয়েছে বেশি। তাই, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই বারণ করেনি, অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে করে অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না পারে। ইসলাম মনে করে "Prevention is better than the cure" অর্থাৎ, দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর।

একজন নারী, যিনি তাঁর পোশাক ও চলা-ফেরায় পর্দার নিয়মাবলী বা 'হিজাব' পালন করে থাকেন, তিনি সাধারণত অন্য পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হন না। এভাবে একজন মুসলিম নারী 'হিজাব' বা পর্দা-পালনের মাধ্যমে অনেক সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন, যা আজ পশ্চিমা জগতের নারীরা অহরহ মোকাবিলা করছেন।

ইসলাম নিঃসন্দেহে পর্দাপ্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁকে এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে, যার ফলে একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দে তাঁর কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে। পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান করেছে। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবো যে, পর্দা বা হিজাব পালনকারী একজন নারী অধিকতর নিরুদ্বেগ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকেন। এটা এই কারণে যে, আত্ম-মর্যাদাশীল নারী হওয়ার জন্য ইসলাম দৈহিক অবয়বের গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে।

সারকথা

সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, যুগ থেকে যুগান্তরে নারীরা ইসলামের প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সক্রিয় থেকে নিজের জীবনও দান করেছেন। আমাদের কন্যারা একসময় ঘরে ঘরে হাফেজা হতো , যুগশ্রেষ্ঠ আলিমাহ, মুহাদ্দিস হতো । আমরা জানি ঘর হচ্ছে সমাজের দূর্গ। আর মুসলিম সমাজে নারী হল ঘরের রাণী। এজন্য ঘরের সার্বিক পরিবেশ নির্ভর করে নারীদের দ্বীনদারীর উপর। নারীরা নেককার হলে, সৎ চরিত্রের অধিকারী হলে বাচ্চারাও নেককার হবে। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। তাদের মধ্যেও দ্বীনদারী সৃষ্টি হবে। এজন্য মুসলমান নারীদের দ্বীনি শিক্ষা এবং উত্তম দীক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন । এই ক্ষেত্রে চমৎকার একটা কথা প্রচলন আছে–

'পুরুষ শিক্ষিত হলে ব্যক্তি শিক্ষিত হয়। আর নারী শিক্ষিত হলে গোটা পরিবার শিক্ষিত হয়।'

জনৈক ইংরেজি মনিষী বলেছেন, *তোমরা আমাকে একজন আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ জাতি দিব।*

তাই মুসলিম নারীদের ইসলামিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা সময়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মায়ের কাছ থেকে দীন শিখতে পারে। অন্তরে দীনের মহাব্বত, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পয়দা করতে পারে এবং নবীর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে বিশ্বজুড়ে আলো ছড়াতে পারে। চন্দ্র সূর্যের মতো কিরণ বিলাতে পারে।

References:

১। 'আফিফী, মুহাম্মদ সাদিক আল-মারতুওয়া, আল-মারআহ ওয়া হুকুকুহা ফিল ইসলাম, বৈরুত: দারুল ইহইয়াইতু তুরাসিল আরাবী, তা. বি, পৃ. ১৩; হুসায়ন, সাদিক, তালীমুল মারআতি ফিল ইসলাম, আল-বাছুল ইসলামী, লক্ষ্মৌ: মুয়াসসাসাতুস সাহাফা ওয়ান নাশর, ১৪২০ হি:, সংখ্যা, ৬. পৃ. ৩৬।'

২। সিমোন, ডি. বিভোয়া, দ্য সেকেন্ড সেক্স, ঢাকা: এশিয়াটিক পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ১৫।

৩। হেমা, আসমা জাহান, ইসলামের ছায়াতলে নারী, ঢাকা: আল-এছহাক প্রকাশনী, পৃ. ৩০।

৪।বুখারী, হায়েয অধ্যায়।

৫। তিরমিযী, তাহারাত অধ্যায়।

৬। সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৭১।
৭। সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩২
৮। সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৯৭।
৯। সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৫।
১০। সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩৫-৩৬।
১১। সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২০-১২১।
১২। যেমন দেখুন, বুখারী, আদব অধ্যায়।
১৩। তিরমিযী, তাহারাত অধ্যায়।
১৪। সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৪।
১৫। তিরমিযী, সদাচার ও সুসম্পর্ক অধ্যায়।
১৬। দুয়ালিবী, মানবাধকিার, পৃ. ৪-৫; আরও দেখুন, ১৭৮৭ সালে প্রকাশিত আমেরিকার সংবিধান। আমেরিকায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত কেবল শ্বেতাঙ্গ স্বাধীনরাই নাগরিকত্ব পেত এবং নারীকে কোনো সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হতো না। দেখুন, ডারইউন, সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা।
১৭। সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৬০।
১৮। সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১।
১৯। আবুল আ'লা, সাইয়েদ, পর্দা ও ইসলাম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১০।) এ প্রসঙ্গে মোস্তাম নামক এক খ্রিষ্ট ধর্মযাজক বলেন, “নারী এক অনিবার্য আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।” (খরনৎধ, ডড়সধহ যড়ড়ফ ধহফ ঃযব ইরনষব, ঘবি ণড়ৎশ, ১৯৬১, ঢ়. ১৮; ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪।)

২০। জাফর, আবু, নারী স্বাধীনতা: ইসলাম ও পাশ্চাত্য বিশ্ব, ঢাকা: পালাবদল পাবলিকেশন্স লি:, ২০০১, পৃ. ৭৩।)
২১। https://www.onnoekdiganta.com/article/detail/11394
২২। https://m.dailyinqilab.com/article/273809
২৩। https://at-tahreek.com/article_details/7942
২৪। https://www.alkawsar.com/bn/article/402/
২৫। ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী , ড. সাইয়েদ আস-আদ গীলানী (পৃষ্ঠা -৩৩)

২৬। মানব সভ্যতা বিনির্মাণে নারী , মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন (পৃষ্ঠা ২৮,২৯, ৪৫, ৫৮, ১০২-১০৫)
২৭। আল মুহাদ্দিসাত, ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভী (পৃষ্ঠা ৩৫১)
২৮। ইসলামী দাওয়াত ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) মহিলা সাহাবা, ড. রাশীদাহ (পৃষ্ঠা ৮২- ৯৩)
২৯। ইসলামে নারীর অবদান , সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ(পৃষ্ঠা ১৪-২০)